মে ২০১৭ □ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

ফিরে এসেছিলেন তিনি

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ

ভালোবাসা ও গানের কবি নজরুল

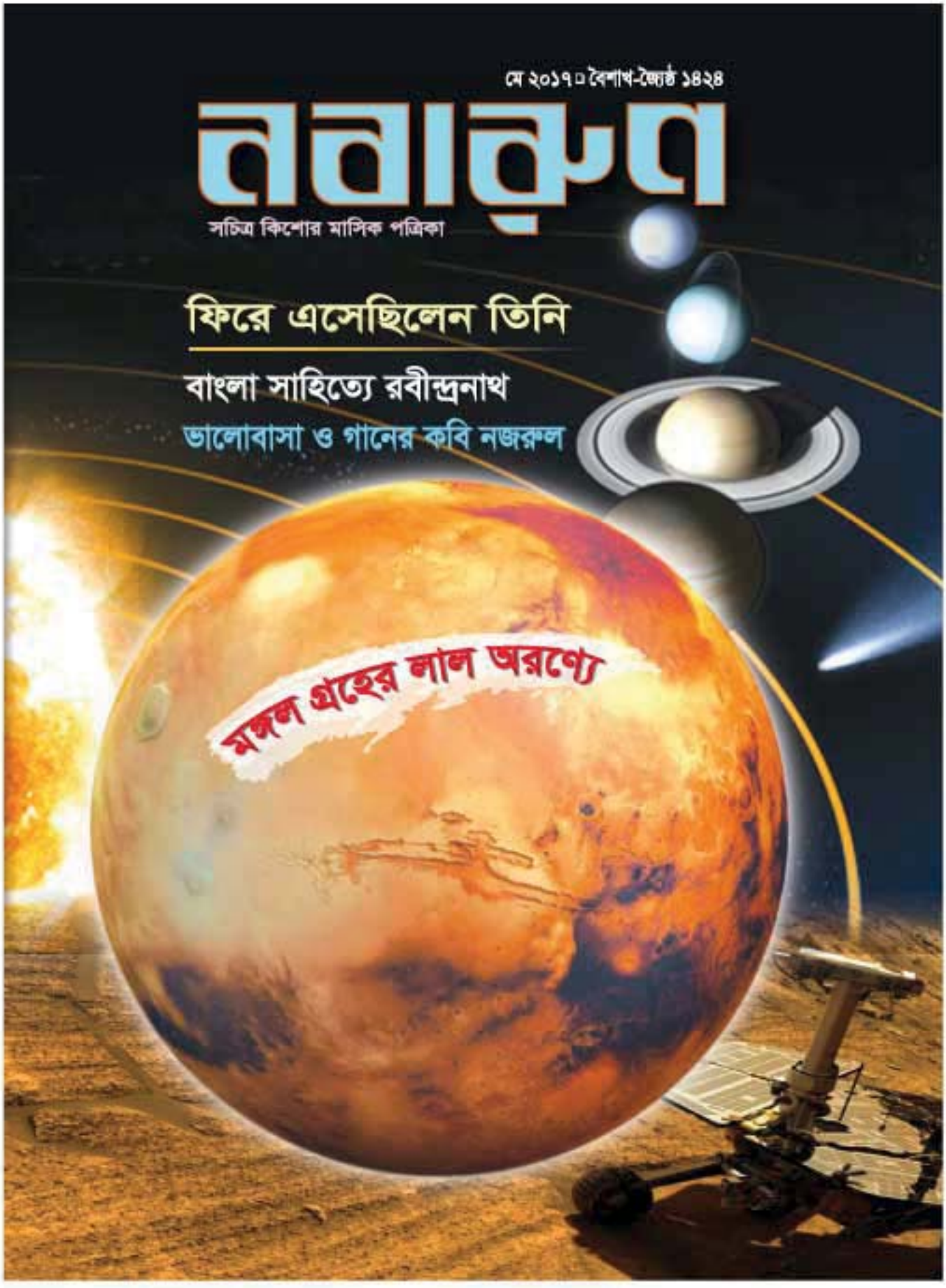

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়
লেখা পাঠাও গ্রাহক হও

নবারুণ-এর চাঁদা বার্ষিক ২৪০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১২০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

- গ্রাহকগণ পত্র লেখার সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করবেন।
  বছরের যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যাবে। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী সংখ্যা থেকে নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত ডাকযোগে পাঠানো হয়।

- নবারুণ পত্রিকার সাথে যুক্ত হতে ফেইসবুকে লগ ইন করো Nobarun Potrika নামে।
  বন্ধু হও নবারুণ-এর।
  আর হ্যাঁ, ই-মেইলে লেখা পাঠাতে চাইলে SutonnyMJ ফন্টে পাঠিয়ে দাও এই ঠিকানায়:
  editornobarun@dfp.gov.bd

এজেন্টদের কপি ভি.পি. যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না।
এজেন্টদের কমিশন শতকরা ৩৩% হারে দেওয়া হয়।
এজেন্ট ও গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বন্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ :dfpsb@yahoo.com • নবারুণ: editornobarun@dfp.gov.bd • বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

মে ২০১৭ ■ বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪

সৌজন্য সংখ্যা

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসহাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মোঃ এনামুল কবীর

সম্পাদক
নাসরীন জাহান লিপি

শিল্প নির্দেশক
সন্তীব কুমার সরকার

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
ফিরোজ চন্দ্র বর্ম্মন

সম্পাদকীয় সহযোগী
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফফাত আঁখি

সহযোগী শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

অলংকরণ
সুবর্ণা শীল
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সেগুন বাগিচা রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২, ৯৩৩১১৮৫
E-mail : editornabarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সেগুন বাগিচা রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সম্পাদকীয়

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা, আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে পরিবারের সবাইকে হারিয়েছেন ঘাতকের নির্মম আঘাতে। বিদেশে থাকায় বেঁচে যান তিনি এবং তাঁর ছোটো বোনটি। পাহাড় সমান শোক ছিল সবাইকে হারিয়ে ফেলা এই মানুষটির বুকে। এই শোককে শক্তিতে পরিণত করে ফিরে এসেছিলেন তিনি, ১৯৮১ সালের ১৭ মে তারিখে। শুরু করেছিলেন দেশ গড়ার সংগ্রাম। সফল করে তুলছেন জাতির পিতার স্বপ্নকে। যেমন ধরো, শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। মহান মে দিবস হিসেবে ১ মে তারিখটিকে জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণা করেছিলেন তিনি। শ্রমিকের উন্নয়নে নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন। আর তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুশ্রমের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। তিনি বলেছেন, 'শিশুদের আমরা শ্রমিক হিসেবে দেখতে চাই না।' সত্যিই বন্ধুরা। শিশুদের যাতে শ্রমিক হতে না হয়, সে লক্ষ্যে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী। ২০২৫ সালের পর এই দেশে আর কোনো শিশুকে শ্রমিক হতে হবে না।

তখন শিশুরা কী করবে?

কবিগুরুর গানের সুরে গাইবে—আমরা সবাই রাজা! বিদ্রোহী কবির কবিতায় কণ্ঠ মিলিয়ে বলবে— বল বীর! আমি চির উন্নত শির!

সূচি

নিবন্ধ

০৩ ফিরে এসেছিলেন তিনি / তানিয়া খান
০৫ শিশুদের বন্ধু শেখ হাসিনা / সুলতানা বেগম
০৬ মে দিবস ও আমাদের শিশুরা / শাহানা আফরোজ
০৯ তোমাদের জন্যই ভোরের আকাশ / সাহিদা সাম্য লীনা
১০ মা দিবস ও আমাদের মায়েরা / নুসরাত জাহান
১৩ পান্থ রহমান : আমার আত্মজ, আমার বিস্ময় / আফরোজা পারভীন
১৯ বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ / মংহেনচীং মংছিন
২০ ভালোবাসা ও গানের কবি নজরুল / মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
২৩ ত্যাগ ও বীরত্বের সাক্ষর : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর / মোস্তফা হোসেইন
২৫ মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যে / সানাউল্লাহ আল-মুবীন
৩১ মঙ্গলগ্রহ নিয়ে চলচ্চিত্র / প্রসেনজিৎ কুমার দে
৩৫ জে. কে. রাওলিং : হ্যারি পটার স্রষ্টা / শাহাদাৎ শাহেদ

গল্প

১১ পতাকায় যা আছে / শম্পা প্রনীতি
৩২ দাদির গল্প / নাসিম সুলতানা
৩৮ ঝুলি / শরীফ খান
৫০ বানর জাদুকর / সৌর শাইন

ছোটোদের গল্প

৫৩ বিস্কিট দৌড় / তাসনীম বিন আলম

সাফল্য

৫৭ ক্রিকেট বিশ্বকাপ : আমরা করব জয় / মেজবাউল হক
৫৮ নারীর ক্ষমতায়ন : কন্যাশিশুর সাফল্য / জান্নাতে রোজী
৬০ সায়মা ওয়াজেদ : ডব্লিউএইচও'র অটিজম বিষয়ক আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন / তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৬১ স্বাস্থ্য : শিশু বিকাশ / মো. জামাল উদ্দিন
৬৫ তোমাকে অভিবাদন বাংলাদেশ / সানিয়া ইফফাত আঁখি

বড়োদের কবিতা

০৬ আসলাম সানী
০৭ শ্যামল দত্ত
০৮ আবেদীন জনী/আব্দুল বাছিত
ফজলে আহমেদ/ আহমেদ টিকু
৩৪ শাফিকুর রাহী
৪৭ নাসের মাহমুদ/কাজী মোহিনী ইসলাম
৪৮ মোহাম্মদ মাকসুদ / জাফরুল আহসান/এইচ এস সরোয়ারদী
৪৯ জাহাঙ্গীর আলম জাহান/চান মিয়া চান্দু/ অমিত কুমার কুণ্ডু

মাকে নিয়ে কবিতা

১০ আবু ইউসুফ সুমন / সাবেরা আফরীন শান্তা
১৮ আবুল হোসেন আজাদ / হামিদা খানম

কবিতায় রবীন্দ্র-নজরুল

২২ নীহার মোশারফ / জসীম মেহবুব / মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ কাওসার

ছোটোদের লেখা

৫৪ ছোট মামা : আমি যে বইটি পড়েছি/কুশল মাহমুদ নিয়োগী
৫৬ প্রিয় ক্রিকেটার : মাশরাফি বিন মর্তুজা /রেজওয়ান মাহমুদ

ছোটোদের ছড়া

৫৫ জুনাইদ তৌহিদ / ইসরাত মোহনা জামান/তামজিদ

ছোটোদের আঁকা

৬২ অয়ালিদ হাসান / মাকনুন মুরছাহা
৬৩ মিথিলা মাহবুব / লিলি বিশ্বাস
৬৪ আবিদুর রহমান / মোবারক হোসেন
৬৫ কাজী সিফাত রায়হান / মো. ওয়াজেদ হোসেন পরশ

সন্ধ্যেবেলা আকাশের পশ্চিমদিকে তাকালে কখনো কখনো একটি লাল তারাকে সকলের আগে ফুটে উঠতে দেখা যায়। এইটেই মঙ্গলগ্রহ। সূর্যের চতুর্থ গ্রহ। সূর্য থেকে প্রায় বাইশ কোটি কিলোমিটার দূরে এর বাস। পৃথিবীর দেড়গুণ। আমাদের দ্বিতীয় কাছের গ্রহটি সম্বন্ধে জানতে পড় পৃষ্ঠা ২৫ - ৩১

ফিরে এসেছিলেন তিনি

তানিয়া খান

খুব বৃষ্টি ছিল সেদিন।
কোন্ দিন?
১৭ মে, ১৯৮১।

তুমুল বৃষ্টির মাঝে প্লেন থেকে নেমে এলেন তিনি। ছয় বছর পর নিজের দেশে ফিরেছেন।

মনে পড়ে গেল ছয় বছর আগেকার কথা। তখন তার সব ছিল, বাবা-মা-ভাইরা, পরিবারের অন্য আত্মীয়রা। ছোটো ভাইটা আঁচল টেনে ধরেছিল আদর নেবে বলে।

আজ তাঁর সেই মানুষগুলো নেই। ছোটো বোনটাকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন বিদেশে। কেবল এই বোনটাই বেঁচে আছে। আর সবাই শহিদ হয়েছেন। রাতের অন্ধকারে ভয়ানক কিছু দানব আক্রমণ করেছিল। বাঁচতে দেয়নি কাউকে। তিনি থাকলে তিনিও বাঁচতে পারতেন না। তাঁর ছোটো বোনটাও বাঁচতেন না।

তিনি বেঁচে গেলেন। তোমরাই বলো, সবাইকে হারিয়ে তিনি আসলে কি বেঁচে ছিলেন?

দুঃসহ কান্না তাঁর জীবনীশক্তি কেড়ে নিয়েছিল। এরপরও তিনি হেরে যাননি। কেননা, তিনি বঙ্গবন্ধুর

সন্তান, তিনি তো হেরে যেতে পারেন না। সেই সে বঙ্গবন্ধু, যিনি এ দেশকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। সেই সে বঙ্গবন্ধু, যিনি দেশের মানুষকে আহবান করেছিলেন স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে। সেই সে বঙ্গবন্ধু, যাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে বাংলার মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছিল। সর্বস্ব ত্যাগ করেছিল। ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতা। দেশ হয়েছিল স্বাধীন।

বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছেন বলে বাংলাদেশের শত্রুরা প্রতিশোধ নিতে চাইল। চরম আঘাত হানল বঙ্গবন্ধুর বুকে। বঙ্গবন্ধুর রক্তের কোনো সম্পর্ককে বাঁচতে দেবে না। বঙ্গবন্ধুর কোনো স্মৃতি থাকতে পারবে না। তাঁর নাম কেউ নিতে পারবে না। বঙ্গবন্ধু শহিদ হওয়ার পর যারা ক্ষমতায় এসেছিল, তারা আইন করেছিল। বিশ্বাস হয় না, তবুও এটাই সত্য। তারা আইন করেছিল, কেউ যাতে বঙ্গবন্ধুর নাম না নেয়। না মুখে, না লেখায়---বঙ্গবন্ধুর নাম ভুলে যেতে হবে সবাইকে।

বঙ্গবন্ধু তো একটি নাম নন। তিনি একটি চেতনা। তিনি বাঙালির আত্মা। মানুষ তার আত্মা ছাড়া বাঁচে না। বাঙালিও বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া বাঁচতে শেখেনি। আর তাই বঙ্গবন্ধু স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলেন এ দেশের বুকে। আর ঠিক এই কাজটি সম্ভব করে তুলতেই তিনি ফিরে এসেছিলেন। কেননা, তিনি ফিরে আসুক, সেটা সেই তখনকার ক্ষমতাধর সরকার চায়নি। নানা ভাবে বাধা দিয়েছে। সব বাধা ডিঙিয়ে তিনি ফিরলেন।

খুব বৃষ্টি ছিল সেদিন। তাঁর চোখের পানি আর বৃষ্টির পানি এক হয়ে গেল। তাঁকে বরণ করতে বিমানবন্দরে তখন লাখো জনতা। তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'বাংলার মানুষের মুক্তি সংগ্রামে অংশ নেওয়ার জন্য আমি দেশে এসেছি।' স্বজন হারানোর বেদনায় কাতর বঙ্গবন্ধু কন্যা অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলেন, '...আমি সামান্য মেয়ে। সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে থেকে আমি ঘর-সংসার করছিলাম। কিন্তু সবকিছু হারিয়ে আপনাদের মাঝে এসেছি। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথে তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জাতির পিতা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে আমি জীবন উৎসর্গ করতে চাই। বাংলার দুঃখী মানুষের সেবায় আমি আমার এ জীবন দান করতে চাই। আমার আর হারাবার কিছুই নেই। পিতা-মাতা, ছোটোভাই রাসেলসহ সকলকে হারিয়ে আমি আপনাদের কাছে এসেছি, আমি আপনাদের মাঝেই তাদেরকে ফিরে পেতে চাই।'

ঠিক তাই। বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে সফল করতে ফিরে এসেছিলেন। যে দেশের মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধুর বুক ভরা ভালোবাসা ছিল, তাদের জন্যই তিনি ফিরে এলেন। নিজের দুঃখকে শক্তি বানিয়ে শুরু করলেন নতুন যুদ্ধ। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া এ দেশ মুক্তিযুদ্ধকে ভুলে যাচ্ছিল, সেই ভুল শোধরানোর যুদ্ধ। সারা দেশে ছুটে বেড়ালেন। দেশে ফেরার ১৫ বছরের মাথায় ভোটের মাধ্যমে দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন। জনগণের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দেশটাকে গড়ে তোলার শাসন ক্ষমতা অর্জন করলেন। পাঁচ বছর দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকার পরিচালনা করে দেশকে নিয়ে যান উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে। এরপর আবারও ষড়যন্ত্র। এমনকি বারবার তাঁর উপর প্রাণঘাতী হামলাও হয়েছে। এতেও দমে যাননি তিনি। আহত হয়েছেন, কিন্তু থেমে যাননি। ফলে ২০০৯ সালের নির্বাচনে আবারও জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলেন। এরই ধারাবাহিকতা এল ২০১৪ সালের নির্বাচনেও।

আলোর গতিতে তিনি ছুটে চলেছেন স্বপ্ন পূরণের পথে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল আজকের এই সফল বাংলাদেশ। আগের মতো বিদেশি সাহায্য দিয়ে দেশকে চলতে হয় না। নিজের অর্থে পদ্মা সেতুর মতো বিশাল কাজ করছি আমরাই। বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে মধ্যম আয়ের দেশে। ২০১০ সালে নিউইয়র্ক টাইমস সাময়িকীর অনলাইন জরিপে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ১০ নারীর মধ্যে ষষ্ঠ স্থানে ছিলেন তিনি। ২০১৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ ৭০তম অধিবেশনে পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' লাভ করেন। এছাড়া তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে, অনন্য অবদানের জন্য 'আইসিটি টেকসই উন্নয়ন' পুরস্কার লাভ করেন।

বন্ধুরা, নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ, আমি কার ফিরে আসার কথা বলছি। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড়ো সন্তান, আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১৯৮১ সালের ১৭ মে তারিখে তিনি আবার এ দেশে ফিরে এসেছিলেন বলে আমরা কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। আর তাই ১৭ মে তারিখটিও আমাদের জন্য বড়ো আনন্দের দিন।

শিশুদের বন্ধু শেখ হাসিনা

সুলতানা বেগম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে শিশু-কিশোরদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশের উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের উপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের ভালোবাসতেন। তিনি চেয়েছিলেন দেশের প্রতিটি শিশু যেন শিক্ষিত হয়। বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে শিশুদের কল্যাণে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও শিশুদের খুব ভালোবাসেন এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ ব্যবহার করেন।

শিশু-কিশোররা জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। ধনী-দরিদ্র সব পরিবারের শিশুদের রয়েছে সমান অধিকার। তিনি শিশুদের জাতির যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চান। তাঁর লক্ষ্য- কোনো শিশু যেন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা, অতিরিক্ত বইয়ের বোঝা চাপিয়ে না দেওয়া, মিথ্যা কথা না শেখানো এবং রাজনৈতিক কাজে শিশুদের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি মনে করেন প্রত্যেক শিশুর মাঝে রয়েছে সুপ্ত প্রতিভা। তিনি শিশুদের কল্যাণে স্কুল ফিডিং এবং প্রতিটি শিশু যেন শিক্ষিত হয় এলক্ষ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রের অবহেলিত শিশুদের কল্যাণে বঙ্গবন্ধু কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে প্রতিবছর বৃত্তি প্রদান করেন। এছাড়া কোনো শিশু যেন বিপথে না যায় এবং জঙ্গি, সন্ত্রাস ও মাদকাসক্ত হয়ে না পড়ে সে ব্যাপারে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সচেতন হওয়ার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী। কেউ যদি বিপথগামী হওয়ার পর আবার ফিরে আসতে চায় তবে তাদের পুনর্বাসন করা হবে।

আমাদের সমাজের আর একটা অংশ হচ্ছে বিশেষ শিশু। এই বিশেষ শিশুদের স্বপ্ন আছে, আছে চাওয়া-পাওয়ার আনন্দ। তিনি এই বিশেষ শিশুদের অভিভাবকদের মনোবল রাখার এবং সাধারণ স্কুলে ভর্তি করার পরামর্শ দেন, যাতে স্বাভাবিক ছেলেমেয়ের সঙ্গে মিশতে পারে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত শিশু শনাক্তকরণসহ বিনামূল্যে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৩২টি মোবাইল থেরাপি ভ্যান চালু করেছেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি তাদেরকে খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়েছে তাঁর সরকার। প্রধানমন্ত্রী বিশেষ শিশুদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেন এবং তাদের মেধার প্রশংসা করেন। তিনি তাদের এতই ভালোবাসেন যে, ঈদ ও নববর্ষের কার্ডে তাদের আঁকা ছবি ব্যবহার করেন।

দেশের সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের কল্যাণেও প্রধানমন্ত্রী কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, সব শিশুই স্কুলে যাবে। টোকাই বা পথশিশু বলে বাংলাদেশে কিছু থাকবে না। এলক্ষ্যে তাদের পুনর্বাসন এবং প্রাথমিক পর্যন্ত শিক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব নিয়েছে তাঁর সরকার। তাদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শিশুদের শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার না করার এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ না করার ব্যাপারেও সতর্কতা অবলম্বন করেন।

দুঃসাহসী শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রীর ভালোবাসা অসীম। তার প্রমাণ দুঃসাহসী বালক শীর্ষেন্দু বিশ্বাস। সে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করে পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলার পায়রা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করে দেওয়ার জন্য। শীর্ষেন্দুর নদীকেন্দ্রিক নিরাপত্তা সচেতনতা প্রধানমন্ত্রীকে মুগ্ধ করেছে। তাই তিনি পায়রা নদীতে সেতু নির্মাণ করা হবে বলে আশ্বস্ত করেন শীর্ষেন্দুকে।

মে দিবস ও আমাদের শিশুরা

শাহানা আফরোজ

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ১ মে। ১৯৮৬ সালের এই দিনে শিকাগোর হে মার্কেটে দৈনিক আট কর্মঘন্টা ও ন্যায্য মজুরির দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল রাজপথ। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবি মেনে নেয়। ১৮৮৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত শ্রমিকদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মে মাসের প্রথম দিন 'মে দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। সেই থেকে সারা পৃথিবীতে এ দিনটি মে দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

শ্রমিক একটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ জন সম্পদ। এরা উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত। দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের প্রধান হাতিয়ার। ন্যায্য মজুরি, কর্মপরিবেশ, ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার, নিরাপত্তাসহ শ্রমিকদের সকল অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যেই পালিত হয় মে দিবস। শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে নাজুক পরিস্থিতিতে আছে শিশু শ্রমিকরা। নানা প্রতিকূল পরিবেশের কারণে শিশুরা শ্রমিক হয়। যদিও শিশুশ্রম আন্তর্জাতিক এবং জাতীয়ভাবে আইনত স্বীকৃত নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজো শিশুশ্রম আছে। বাংলাদেশেও কিছু শিশু শ্রমিক রয়েছে তবে বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্রুত তা কমছে। বর্তমান সরকার শিশুদের নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে। শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য সবাইকে উপবৃত্তি এবং শিক্ষা উপকরণ দিচ্ছে। বিভিন্ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে শ্রমজীবী শিশুদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে এবং শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করছে। যেন প্রতি শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে নিজের পছন্দমতো পেশা বেছে নিতে পারে।

সরকার গৃহকাজে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য করেছে নীতিমালা। ১৪ বছরের নিচে যেন কোনো শিশু গৃহে কাজ না করে তার জন্য আইন করেছে এবং তা বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়াও শিশুশ্রমের ব্যাপারে দিয়েছে কঠোর সর্তকতা।

শুধু সরকার নয়, এগিয়ে আসতে হবে আমাদের প্রত্যেককে। যে যার জায়গা থেকে যদি সচেতন হই, তবে বাংলাদেশে ২০২৫ সালের পর কোনো শিশু শ্রমিক থাকবে না। সেদিন বেশি দূরে নয় যখন বাংলাদেশের প্রতিটি সন্তান হবে শিক্ষিত। দেশ হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। গড়ে উঠবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা।

ছোট্ট মনের স্বপ্ন

আসলাম সানী

ছোট্ট মনের স্বপ্ন
বড়ো হব-ভালো হব
এই জগতের আলো হব
আজো আছি-কালও হব,

সূর্য হব-চাঁদও হব
বাবা-মায়ের সাধও হব,

ফুলের মতো-পাখির মতো
ফুটব-উড়ব অবিরত
এইতো ইচ্ছে এইতো ব্রত,

স্বপ্ন মনের এই—
ছড়িয়ে দিলাম এই জগতের
সবারই মাঝেই—
আর হতাশা নেই
দুঃখ—কষ্ট নেই।

প্রিয় মুখ

শ্যামল দত্ত

স্কুলের ড্রয়িং স্যার কঠিন ভীষণ
তাঁর দেওয়া আজগুবি এ কম্পিটিশন।
ক্লাসে ঢুকে বললেন, 'লুক অ্যাট মি লুক
ঝটপট এঁকে ফেলো প্রিয় কারো মুখ।
যে-কোনো একজনের মুখ হলেও হবে
আঁকা শেষ হলে পড়ে ছুটি পাবে তবে'।

চশমা কপালে তুলে ক্লু দিলেন স্যার–
'ভাবো সবচেয়ে বেশি প্রিয় কে তোমার।
কার সাথে বেশি দেখা হয় ভাবো রোজ,
কে তোমার সবচেয়ে বেশি রাখে খোঁজ।
চোখ বুজে ভাবলেই দেখা পাবে তার,
চাইলেই পেয়ে যাও উপকার যার'।

পেন্সিল হাতে নিয়ে খোকা ভেবে সারা
চাইলেই উপকার তার করেন কারা।
বাবা বিজনেসম্যান, দেখা হয় কম
একজন থাকে ওর সাথে হরদম।
চোখ বুজলেই তার মুখ দেখা যায়,
এবার খোকার আঁকা কে আর আটকায়?

ছবিটা দেখেই স্যার কুঁচকান ভুরু
তখনই খোকার শুরু বুক দুরু দুরু।
খুক খুক কেশে স্যার কন গলা ঝেড়ে–
'দাড়ি-গোঁফঅলা এই মুখটা কে রে'?
ফিক করে হেসে ফেলে বাবু বলে, 'স্যার,
এ মুখটা খোকাদের বুড়ো ড্রাইভার'।

পেন্সিল হাতে নিয়ে খোকা বসে ফের
ভাবনায় উপকারী মুখ যে আরেক।
যে থাকে খোকার সাথে প্রায় সারাক্ষণ
তার মুখ ভাবে খোকা, সেই প্রিয়জন।

এবার ছবিটা দেখে হাসিমুখ স্যার–
'এত ছোটো মেয়েটা কে, এ মুখটা কার?
লাল ফিতে বাঁধা দেখি বব-ছাঁট চুল'।
খোকা হেসে বলে, 'স্যার, ওর নাম ফুল'।
ওর মা রান্না করে, বাবা দারোয়ান
ও থাকে খোকার সাথে সারা দিনমান।

স্যার হেসে বললেন, 'বুঝলাম সেটা
কিন্তু কীভাবে প্রিয় কাজের মেয়েটা?
বুড়ো ড্রাইভারও তোর কেনই যে প্রিয়

বিষয়টা গোলমেলে, অকল্পনীয়'।
মাথা নিচু করে খোকা চুপচাপ ভাবে,
কী করে বিষয়টা ও স্যারকে বোঝাবে?

উপকারী মানুষ মানুষের প্রিয় হয়
বড়ো হলে সেটা জানা যাবে নিশ্চয়।
কাছাকাছি থেকে যারা খুব ভালোবাসে
তাদের মুখগুলোই বেশি মনে ভাসে।
সবচেয়ে প্রিয় তাই এখন খোকার
ফুল আর দাড়ি-গোঁফঅলা ড্রাইভার।

খুকিরা আজ দুঃসাহসী

আবেদীন জনী

একটি খুকি ছবি আঁকে, নিপুণ তুলির টান
একটি খুকি নাম ছড়াল লিখে কাব্য-গান।
একটি খুকি চালায় বিমান, ওড়ে আকাশপুরে
একটি খুকি বিশ্ব মাতায় গানের সুরে সুরে।
একটি খুকি ক্রিকেট খেলায় দক্ষ ব্যাটে-বলে
একটি খুকি মুক্তো কুড়ায় ভয়াল সাগরজলে।
একটি খুকি জয় করেছে হিমালয়ের চূড়া
একটি খুকি শিকল ভেঙে করল গুঁড়া গুঁড়া।
একটি খুকি দেশের মায়ায় প্রাণটি বাজি রাখে
একটি খুকি হিম কুয়াশায় স্বর্ণালি রোদ মাখে।
একটি খুকি ঝড়-বাদলে ভয় করে না মোটে
একটি খুকি আঁধার ছিঁড়ে আলোর দিকে ছোটে।
খুকিরা আজ দুঃসাহসী, দারুণ স্বপ্নবাজ
পেছনে ফেরার নেইকো সময়, সামনে অনেক কাজ।

আমরা শিশু

আব্দুল বাছিত

আমরা শিশু ফুলের মতো
ভবিষ্যতের কাণ্ডারি
শিক্ষা দিয়ে পূর্ণ করি
জ্ঞানের আসল ভাণ্ডার-ই।
মন মননে শান্ত পরশ
সম্ভাবনার অন্ত নাই
প্রতিভার বিকাশেতে
খাঁটি একটি যন্ত্র চাই।
সম্ভাবনার বীজটি ফুটুক
সকল শিশুর ফুলবাগে
ছড়াক আলো সরাক কালো
দেশের ধরুক কূল আগে।

আলোর গান

ফজলে আহমেদ

রবির মতো জ্বলব আমি
ফুলের মতো হাসব
আঁধার তাড়িয়ে দিয়ে
আলোর ডানায় ভাসব।
হাজার তারার মিলন মেলায়
বসবে চাঁদের হাট
চাঁদের আলোয় হাসবে তখন
ধান কাউনের মাঠ।
সেই আলোতে আলো হবে
আমার ভুবন খানি
কেমন করে জ্বলতে হবে
সবতো আমি জানি।
চপল বাতাস শেখায় গতি
চলতে শেখায় নদী
পাহাড় আমার সাহস জোগায়
নিত্য নিরবধি।
নীল সাগরের ঢেউয়ের খেলা
পাখির কলতান
তারাই আমায় দেয় যে বলে
গাইতে আলোর গান।

শিশুর কামনা

আহমেদ টিকু

আমরা যারা আজকে শিশু
বাংলাদেশে বাস।
নতুন করে লিখব মোরা
বিশ্বের ইতিহাস।

প্রেম-পুণ্য সৌহার্দ্যের বাণী
ছড়িয়ে দেবো ভবে।
নতুন করে একই সুরে
গান গাইব সবে।

শিক্ষা-দীক্ষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে
এগিয়ে যাব আমরা।
আমাদের কীর্তির কনক আলোয়
মুগ্ধ হবে ধরা।

সারা বিশ্বের সকল শিশু
সব অধিকার পাবে।
বাধাবিঘ্ন, দুঃখ-কষ্ট
পৃথিবী ছেড়ে যাবে।

তোমাদের জন্যই ভোরের আকাশ

সাহিদা সাম্য লীনা

শিশুকে নিয়ে বাবা-মায়ের হাজারো স্বপ্ন। একটি শিশু একজন অতিথি হয়ে আসবে। এই জগতে আলোর মুখ দেখবে। এ নিয়ে পরিবারের থাকে নানা আয়োজন। নানা উৎকণ্ঠা বাবা-মা, দাদা-দাদি, নানা-নানির।

আর যেই না ফুলের মতো শিশুটির জন্ম হলো, তখন যেন পৃথিবীটা বলতে থাকে– এসো আদরের বাবু, বুকে এসো। দেখো তোমাদের জন্য আমি এক মায়া; এক স্বর্গ। ছোট্ট শিশুরা, শোনো মন দিয়ে। তোমাদের নিয়ে একটি সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখছি আমরা। সেই স্বপ্নটা কি, জানো তোমার? এই পৃথিবীকে আলোতে আলোতে, ভালোতে, ভালোতে ভরিয়ে দেবে তোমরা।

তোমরা এখন অনেক জানো। তোমাদের বুদ্ধির কাছে সব থারাপেরা নত হতে বাধ্য। একটু ভেবেই দেখো। কত পড়ো তোমরা এখন! কত বই তোমাদের! লাল বই,নীল বই, সবুজ বই আরো কত খেলনা! জানো, আমরা না এত বই পেতাম না, যাও পেতাম তা সাদা-কালো। আর খেলনা তা তো দু'নয়নের কিঞ্চিৎ মেঘের ভেলায় কখন ভেসে যেত টেরই পেতাম না। তাই আমাদের স্বপ্ন ছিল ফিকে। আধো আধো বুলিতে নিবু নিবু! প্রদীপ জ্বালাতে পারতাম না স্বপ্নের ঘরে।

আর তোমরা দেখো কত ভাগ্যবান! মেঘ না চাইতে বৃষ্টি! সেই বৃষ্টির কান্নায় তোমাদের জ্বর আসতে পারে তাই ছাতাটাও জুটে যায় অবলীলায়। তোমাদের পড়ার টেবিলেই এখন কম্পিউটার,ট্যাব আরো কত কী! একটা মাউজের ক্লিকে তোমরা জেনে যাচ্ছো পৃথিবীর সব খবরাখবর। তোমাদের অবসর সময় ঘুরার জন্য এখন কত পার্ক! নভোথিয়েটার, ফ্যান্টাসি কিংডম, জাদুঘর। তোমরা এজন্যই বেশি ভালোও। তোমরা পারবে পড়ালেখা করে এই দেশটাকে আরো উঁচুতে নিয়ে যেতে। যা আমরা পারিনি, তা তুমি, তোমরা পারবেই। কি পারবে না?

জানি তুমি মুচকি মুচকি হাসছ; ওরে দুষ্টু আমার লক্ষী ছানা পোনার দল! তোমরা যে পারো, সে গল্প বলি তবে।

সেদিন তোমাদের স্কুলে ছিল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। তকী নামের ছেলেটা দৌড়ে ফার্স্ট হলো। প্রথমে তো ও দৌড় দিতেই পারছিল না। ও ছিল স্কুলের সবচেয়ে বোকা ছেলে। ওকে দেখে মনে হতো অসহায়। সবাই ওকে নিয়ে হাসাহাসি করত।

কিন্তু নতুন আসা রাফু ম্যাডাম ওকে বলেছিলেন, তুমি চেষ্টা করো । তুমি পারবে। তকী, দৌড়াও!

হঠাৎ তকীর কী যে হলো, তকী যেন কী ভাবছে। রাফু ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে সেদিনের ক্লাসের কথা মনে হলো। তিনি একদিন ক্লাসে বলেছিলেন, চেষ্টা করলে শিশুরাও সব পারে। তুমি পারবে না কেন? সে কথাগুলো মনে করেই তকী দৌড়ায়।

হুম! সেদিন তকীই হয়েছিল একশ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট। ইচ্ছা করলে ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা আসলেই সব পারো। দেখো না তোমরা এই ছোটো বয়সেই গল্প লিখে প্রথম , দ্বিতীয় ও তৃতীয় হও। তাও জাতীয় পত্রপত্রিকায়! তোমাদের নিয়ে বিজ্ঞান মেলা হয়। সেখান থেকে খুদে বিজ্ঞানীদের দেখা মিলে। তোমরা এখন নাচে, গানে, ছবি আঁকায় দেশ- বিদেশ ঘোরো। কত মজা তোমাদের।

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা এগিয়ে যাও সামনের দিকে। পিছনে তাকাবে না। দেখো, তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে ভোরের আকাশ। লালচে পুবের কোণে হাসে আশ্বাস তোমাদের জন্যই!

মা দিবস ও আমাদের মায়েরা

ইসরাত জাহান

মা পৃথিবীর সবচেয়ে আপন ও প্রাণের একটি শব্দ। এতে লুকিয়ে আছে গভীর মমত্ববোধ আর ভালোবাসার আকুলতা। মমতাময়ী মা-এর কাছেই সন্তানের হাজারো বায়না, আকুতি। মনের লুকানো সব কথা কেমন করে যেন এই মা জেনে যায়। সব সুখ-দুঃখের একমাত্র প্রিয় বন্ধু মা। সুমধুর এই ডাক মনে এনে দেয় প্রশান্তির ছোঁয়া। বন্ধুরা, মাকে ভালোবাসতে কোনো বিশেষ দিবসের প্রয়োজন নেই। তবু পৃথিবীর সব মায়েদের সম্মান জানাতে কয়েক যুগ ধরে পালন করা হচ্ছে বিশ্ব মা দিবস। প্রতিবছর মে মাসের দ্বিতীয় রোববার বিশ্বব্যাপী এ দিনটি পালিত হয়।

প্রতিটি দিবস পালনের অন্তরালে কিছু ঘটনা থাকে। বিশ্ব মা দিবসও সে সকল ঘটনার উর্ধ্বে নয়। এ দিবসটি পালনের অন্তরালে রয়েছে বহুবিধ ইতিহাস। রয়েছে পালনের সাল ও দিন নিয়ে নানা কথা। কিন্তু এত কিছুর পরেও মায়ের প্রতি সন্তানের অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশের জন্য এ দিনটির আবেদন প্রতিটি সন্তানের কাছে-ই আলাদা এবং আবেগপূর্ণ।

নবারুণের খুদে বন্ধুরা, তোমরাও নিশ্চয়ই এ দিনটির কথা মনে রেখে মা কে শুভেচ্ছা জানিয়েছ। আসলে মা তো সবার থেকে আলাদা। সময়ের সাথে সাথে আমাদের মায়েরা এখন আরো বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে উঠছেন। মায়েরা শুধু সংসার সামলান না, অফিস আদালতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছেন একজন সফল নারী হিসেবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে মায়েদের অংশগ্রহণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ। বর্তমান সরকারও নারীদের অগ্রগতিতে ব্যাপক অবদান রাখছেন। সুযোগ করে দিচ্ছেন প্রতিনিয়ত। তাই নারীর এগিয়ে যাওয়া মানে মায়েদের এগিয়ে যাওয়া। মায়েরা যত এগিয়ে যাবে, তাঁর সন্তানেরা আরো বেশি সফলতা অর্জন করবে। বিশ্ব মা দিবসে প্রতিটি সন্তানের হৃদয় জুড়ে থাকুক মায়ের প্রতি অম্লান ও অক্ষয় ভালোবাসা। জানাই মা-কে হাজারো সালাম।

মাগো তুমি

আবু ইউছুফ সুমন

মাগো তুমি চাঁদ তারাদের
ঝলমলানো হাসি
ঝলসে যাওয়া তপ্ত রোদে
বৃষ্টি রাশি রাশি।

মাগো তুমি দোয়েল ঘুঘুর
মিষ্টি সুরের গান
ক্লান্ত কোনো ভরদুপুরে
বকুল ফুলের ঘ্রাণ।

মাগো তুমি স্নিগ্ধ হাওয়ায়
বাগান ভরা ফল
মরুর বুকে মুসাফিরের
এক পেয়ালা জল।

মাগো তুমি সুখ বাড়িটার
করিডোরের চাবি
তোমায় ছাড়া এই দুনিয়ার
সব যে হাবিজাবি।

সত্যি মাগো ধন্য আমি
তোমার ছায়ায় থেকে
যে ছায়াতে তৃপ্তি তুমি
রাখলে যেন মেখে।

একাদশ শ্রেণি, রামপুরা সিটি কর্পোরেশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মা

সাবেহা আফরীন শান্তা

মা আমার চোখের মণি
আমার সকল আশা
মায়ের প্রতি রইল আমার
অশেষ ভালোবাসা।

অনেক কষ্ট করছেন মা
দিনরাত্রি আমার সুখের জন্য
এমন মা পেয়ে আমার
জীবন হলো ধন্য।

সপ্তম শ্রেণি, শাহীন ক্যাডেট একাডেমি, গাজীপুর

পতাকায় মা আছে

শম্পা প্রদীপ্তি

একটা হাওয়াই মিঠাই দেও তো।
টাকা আছে?
না।
তাইলে তো হইব না বাবা।
তুমি কলম নেবে? আমার কাছে খুব সুন্দর একটা কলম আছে, বাবা দিয়েছে।
না বাবা, আমার কলম লাগত না, তুমি বাড়িত যাও, তুমি এহানে একা একা কী কর? তোমার বাড়ির মানুষ কই?
তুমি আমাকে কলমটা নিয়ে একটা হাওয়াই মিঠাই দাও।
না বাবা তা হইব না, তুমি যাও তো, কলম... কলম...কলম দিয়া আমি কী করতাম?
তুমি ওর সাথে এমনে কথা বইলতাছো কেন? দেখতাছো না, কত্ত ছুডো ছাড়া? আমারে দুটা হাওয়াই মিঠাই দাও।
বাপরে ...! তুই আবার ক্যাডা? তোর টাকা আছে?
হ আছে, এই নাও, বলে বল্টু পকেট থেকে ১০ টাকা বের করে দেয়।
হাওয়াই মিঠাই নিয়ে বল্টু ছোটো ছেলেটাকে একটা দিতে গেল।
নাও, তুমি এইডা নাও।
তুমি আমাকে কেন দিচ্ছ? আমার কাছে তো টাকা নেই।
লাগত না, তুমি নাও।
না, মা বলেছে এমনি এমনি কারো কাছ থেকে কিছু নিতে নেই।
কিচ্ছু হইব না। ধরো তো, তা তোমারে তো দেইক্কা মনে হইতাছে তুমি স্কুল থাইক্কা আইছ, তা এইহানে ক্যান?

তুমি কাউকে বলবে না তো? তুমি আমাকে হাওয়াই মিঠাই দিয়েছ, তুমি আমার বন্ধু।
না কাউরে কমু না ...কও।
আমি স্কুল থেকে পালিয়েছি। ঐ যে দেয়ালটা দেখছ, ওটা আমাদের স্কুলের দেয়াল। এটা পিছন দিক, এখানে একটা বড়ো ফুটো ইঁট দিয়ে ঢাকা আছে, আমি ওটা সরিয়ে বেরিয়ে এসেছি। অঙ্ক ক্লাস শেষ হলেই আবার যাব। অঙ্ক আমার একদম ভালো লাগে না, তারপর আবার আজ হোমওয়ার্ক করে নিয়ে আসিনি, মামনির জ্বর হয়েছে তো, আর বাবা সময় পায়নি দেখার... আমি একা একা হোমওয়ার্ক করতে পারি না।
তা সেইডা তোমার স্যাররে কইলেই তো হইত, পালানোর দরকারডা কী? দেখতাছো না রাস্তাঘাটে কেমন গাড়ি শা...শা...কইরা যায়, যাও স্কুলে যাও।
তুমি যাবে আমাদের স্কুলে?
আমারে তো ঢুকতেই দিব না। জানো আমার স্কুল যাওনের খুব ইচ্ছা আছিল। কিন্তু বাপ-মাও নাই, ক্যাডায় আমায় স্কুলে দিব, কাগজ/পলিথিন টোকাইয়া টোকাইয়া খাই।
বল্টুর কথা প্রাজ্ঞ কতটুকু বুঝল কে জানে, তবে ওর মনে হলো, যেহেতু বল্টু ওকে হাওয়াই মিঠাই দিয়েছে তাই ওর জন্য সে একটা কিছু করবে। তাই বল্টুকে বলল, এস আমার সাথে, আমি তোমাকে স্কুলে নিয়ে যাব, তোমার না স্কুলে যাওয়ার খুব ইচ্ছে?
বল্টু প্রাজ্ঞকে অনুসরণ করল। বল্টুর বয়স খুব বেশি হলে সাত অথবা আট আর প্রাজ্ঞর ছয়। দুজনের এরই মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। কথা দিল মাঝে মাঝেই তাদের দেখা হবে।
স্কুলে ঢুকেই প্রাজ্ঞকে বলল, তুমি তোমার ক্লাসে যাও, আমি একটু ঘুইরা দেইখা চইলা যামু।
বল্টু ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে স্কুল বারান্দা দিয়ে হাঁটছে। হঠাৎ একটা ক্লাস রুমের জানালার কাছে তার হাঁটা থেমে গেল। ক্লাসের ভিতরে স্যার বলছেন, 'তোমরা মাকে ভালোবাসো' ভাবছ ঘরে তো মা আছেনই। কিন্তু মা আরো এক জায়গায় আছেন, তা হলো এই এখানে...এখানে যে পতাকা দেখছ, সবুজের মাঝে লাল সূর্য, এখানে এই পতাকায়ও মা আছেন, এই পতাকাকে মায়ের মতোই ভালোবাসতে জানতে হবে, সম্মান দিতে হবে...। এরপর স্যার আর কী কী বলেন তা বল্টুর শোনা হয় না, তার মাথায় একটা কথাই ঘুরতে থাকে, পতাকায় মা আছে। পতাকাকে ভালোবাসলে মাকে ভালোবাসা হবে...মানে মাকে পাওয়া যাবে...তখন সে একটা পতাকার জন্য প্রায় পাগল হয়ে উঠল।
ঘুরতে ঘুরতে স্কুলের পতাকাটি তার চোখে পড়ে, সে সেখানে দৌড়ে গিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু পতাকাটা তো অনেক ওপরে, সে ধরবে কী করে? গায়ে জড়িয়ে নেবে কী করে? আর ভাবতে পারছে না, তার পতাকাটি চাই-ই চাই...।
সুপারি গাছে ওঠার মতো করে বল্টু বাঁশটা বেয়ে বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে কিন্তু বার বার নিচে নেমে যাচ্ছে। এমন সময় দূর থেকে দারোয়ান তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসে।
এই, এই, তুই এখানে কী করছিস? বল্টুর শরীরের ময়লা ছেড়া পোশাক দেখে খুব সহজেই বোঝা যায় সে কে, তার সাথে কেমন আচরণ করা যায়, তাই দারোয়ান তা বুঝে নিয়ে শাসানো শুরু করল।
বের হ... বের হ...এখান থেকে!
না আমি যামু না, আমারে ওই পতাকাডা দাও।
কী... কী আমার আহ্লাদ রে, পতাকাডা দাও! ভাগ ...ভাগ এখান থেকে! তুই পতাকার কী বুঝিস?
বুঝি আমি বুঝি, তুমি আমারে পতাকাডা দাও...।
যখন বল্টু কিছুতেই আর যাচ্ছে না তখন দারোয়ান বল্টুর গালে কষে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিল, টেনে হিঁচড়ে গেটের দিকে নিয়ে যেতে লাগল।
তাদের চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে কয়েকজন শিক্ষক এসে দাঁড়ান সেখানে।
একজন বললেন, কী হয়েছে, কেন ওকে তুমি ওভাবে নিয়ে যাচ্ছ? এমনি বের করে দাও।
না স্যার সে এমনি যাবে না, খুব টাট্টু পোলা...কয় পতাকাডা আমারে দাও।
কী? পতাকা? সে পতাকা দিয়ে কী করবে?
তাদের কথার মাঝেই বল্টু দারোয়ানের হাত থেকে ছুটে এক দৌড়ে এসে ঐ শিক্ষকের পা জড়িয়ে ধরে।
স্যার আপনে... আপনে কইলেন না তহন, পতাকায় মা আছে, পতাকাকে মায়ের মতো ভালোবাসতে হবে, মায়ের মতো সম্মান করতে হবে। স্যার, আমার তো মা নাই, আমি কুনোদিন চউখ্যে দেহি নাই মা কেমন... আমারে ওই পতাকাডা দেন স্যার, আমি ওটা শইলটাত দিয়া ঘুমাইলে মাকে পামু...মা আমার লগে থাকব... বলে কান্না জুড়ে দিল বল্টু।
উপস্থিত সবাই তার কথা শুনে আর কোনো কথা বলতে পারল না...
বেশ কিছুক্ষণ পর শিক্ষকটি বল্টুর হাত ধরে টেনে তুলে বললেন, তুই যাবি...যাবি আমার সাথে, আমার কোনো সন্তান নেই, তুই না হয় আমার সন্তান হয়ে থাকবি...

পান্থ রহমান
আমার আত্মজ, আমার বিস্ময়

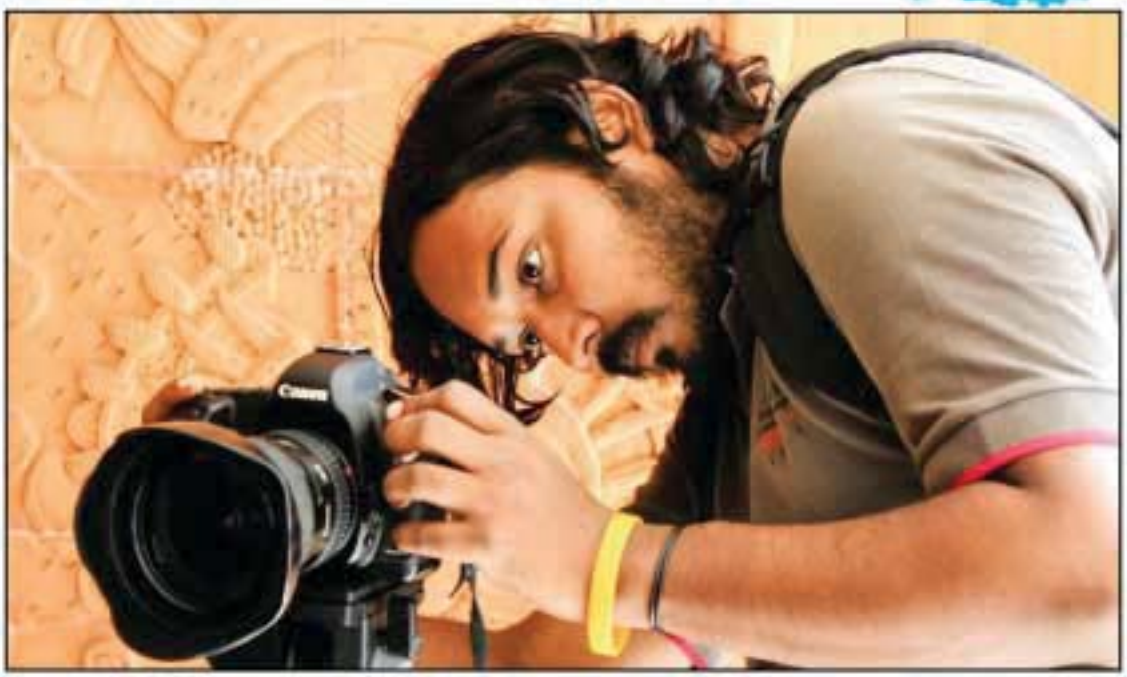

আফরোজা পারভীন

পান্থর নাম রেখেছিলেন আমার মা মতিয়া আহমেদ। মা ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন আলোক প্রাপ্ত। অবিভক্ত বাংলার স্পিকার আর খাদ্যমন্ত্রী সৈয়দ নওশের আলীর ভাগনি তিনি। বিয়ে হয়েছিল নড়াইল মহকুমা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, যশোর জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অ্যাডভোকেট আফসার উদ্দীন আহমেদের সাথে। যাঁর পুরোটা জীবনই রাজনৈতিক ঐতিহ্যমণ্ডিত। মা নিজেও রাজনীতি করতেন। সমাজকর্ম তাঁকে প্রবলভাবে টানত। আর পড়তেন বই, অফুরন্ত বই। সারাদিন-রাত রান্নার ফাঁকে ফাঁকে ঘামে ভেজা শরীর- কিন্তু হাতে তাঁর বই থাকতই। একটু ফুরসত পেলেই হুমড়ি খেয়ে পড়তেন বই-এর ওপরে।

মা মাঝে মাঝেই আওড়াতেন, 'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ। উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ।' এটা শুধু মার মুখের কবিতা ছিল না, ছিল তাঁর বিশ্বাসের কথা। তাই বুঝি আমার ছেলে পান্থ জন্মাবার সাথে সাথেই তিনি বলেছিলেন, 'ওর নাম রাখলাম পান্থ'। আমার স্বামী বিজ্ঞানসাধক লতিফুর রহমান পান্থর নাম রেখেছিল 'সৌর'। সে ভেবেছিল তাঁর ছেলে হবে সৌরশক্তি সম্পন্ন। আমি তাঁর নামটা বাতিল করিনি। বলেছিলাম, 'তুমি তোমার নামে ডেকো'। সে ডাকেনি। আমার মনোভাব বুঝেছিল, মার দেওয়া নামের প্রতি সম্মান রেখেই ডেকে গেছে আমৃত্যু। এ কারণে যে মানুষটি আমার অহর্নিশ শ্রদ্ধার, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আরো বেড়েছে।

পান্থর জন্ম হয়েছিল হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে। মাসটি ছিল জানুয়ারি, তীব্র শীত। ওর জন্মের আগে আমাদের একটি কন্যাসন্তান জন্মের আগে মারা যায়। যে কারণে সন্তানের জন্য প্রতীক্ষা ছিল আমাদের আরো তীব্র। বিশেষ করে লতিফের। মনে আছে, শেষ মুহূর্তে গিয়েছিলাম হলি ফ্যামিলিতে। আর বলতে গেলে বেডে নেওয়ার আগেই জন্ম হয়েছিল ওর। ওজন মাত্র ছয় পাউন্ড দশ আউন্স। নার্স ওর ডান হাতের কবজিতে একটা প্লাস্টিকের বেল্টের মাঝে ওজনটা লিখে রেখেছিল। তা নিয়ে লতিফের ছিল খুব রাগ। ও সারাক্ষণ বলত, 'বাড়িতে গিয়েই ওটা খুলে ফেলব, আমার ছেলেটা ব্যথা পাচ্ছে।'

আর বাড়িতে এসেই খুলে ফেলেছিল। অনেক দিন বেল্টটা যত্নে সংরক্ষণ করেছিলাম আমি। তারপর কী করে যেন হারিয়ে যায়।

কী ফুটফুটে যে ছিল পান্থ। এখন সে রংয়ের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাবে না। খুব চঞ্চল ছিল, সারাদিন জানালা দিয়ে ছুড়ে ছুড়ে এটা ফেলত, ওটা ফেলত। আলু, পটল, বেগুন, লিপস্টিক, পাউডার, কাগজ কিছুই বাদ যেত না। হামাগুড়ি দিতে শেখার পর কলসি ভর্তি পানি উলটে দিত। ভাত-তরকারি ছুড়ে ফেলে হি হি করে হাসত। ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথা হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াত। ধরতে গেলে খিলখিল করে হাসতে হাসতে দৌড় দিত। ওর একটা খুব প্রিয় কাঁথা ছিল। সারাক্ষণ ওটা চিবাতো। কাঁথাটা ধুতে পারতাম না। একই রকম একটা কাঁথা বানিয়ে দেওয়ার পরও ওর হাত থেকে সেটা নেওয়া যায়নি। ওই কাঁথার গন্ধ পান্থ বুঝত। হাত থেকে ছাড়ত না। এটা ছিল আমাদের জন্য মহা সমস্যার!

খেতে চাইত না মোটেও। ভাতের থালা নিয়ে ওর পেছনে ঘুরতে হত। মাছ দিলে বলত মাংস দাও, মাংস দিলে ডিম দাও, ডিম দিলে দুধ দাও, দুধ দিলে চিনি দাও। সে এক অদ্ভুত অবস্থা। বিস্কুট দিলে গুড়ো গুড়ো করত। কেক দিলে দলা দলা। খাওয়া নিয়ে খুব জ্বালিয়েছে ও।

পান্থর ছেলেবেলাটা বেশ ভাসমান কেটেছে। ইটনাতে জলিল নামে একজন পিয়ন ছিল লতিফের। পান্থ ওর পিঠেই থাকত সারাদিন। হাওর অঞ্চলের কী যে এক বিদঘুটে ভাষা শিখেছিল ও। জলিলকে ডাকত জলিল্যা। কপিকে বলত কবি। পিঠকে বলত পিড। কষ্ট পেতাম, ছাড়াতে পারতাম না।

ও খুব ছোটো থাকতে আমার চাকরি হয়ে যায় সিভিল সার্ভিসে। লতিফ তখন ইটনার ইউএনও । আর আমার পোস্টিং হয় কুমিল্লা কালেক্টরেটে। আমি ওই তুলতুলে বাচ্চাটাকে সাথে নিয়ে কুমিল্লায় চলে এলাম। উঠলাম জেলা পরিষদের ডাকবাংলোয়। একদিকে সহকারি কমিশনারের অফিসিয়াল দায়িত্ব, অন্য দিকে বিচার । নতুন চাকরি, মাঝে মাঝেই ট্রেনিং-এ ডাক পড়ত। ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা দিতে ঢাকায় আসতে হত, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিতেও আসতে হত ঢাকায় । পরীক্ষার হলে ডিউটি, ইলেকশন ডিউটি, মোবাইল কোর্ট এসব তো ছিলই। টালমাটাল অবস্থা ছিল আমার। কখনো কাজের লোক পেতাম, কখনো পেতাম না। পান্থকে মোটেই সময় দিতে পারতাম না। দারোয়ান কাদেরের ছেলে, যার গা ভরা ছিল খোসপাঁচড়া। তার সাথেই কাটত পান্থর দিনরাতের অনেকটা সময়। সামনে নিপুর দোকানের পরোটা, হালুয়া ছিল ওর ভীষণ পছন্দের। মাঝে মাঝে অসুস্থ হতো, পড়ে মাথা ফাটাতো। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কাঁদতাম। কিচ্ছু করার ছিল না। চাইলেই ছুটি মিলত না। একসময় অনেক কষ্টের পর ওর বাবা কুমিল্লার মুরাদনগরে উপজেলা নিবাহী অফিসার হয়ে এল। দূরত্ব কিছুটা কমল, কিন্তু সমস্যা মিটল না। দুজন দু স্টেশনে। ইউএনওর চাকরি সার্বক্ষণিক, অনেক বড়ো উপজেলা, অনেক ইউনিয়ন, মন্ত্রীর এলাকা। স্টেশন ছাড়ার পারমিশন নেই। আমি বৃহস্পতিবার যেতাম আবার শুক্রবার ফিরতাম। পান্থ মুরাদনগর গেলে কুমিল্লা ফিরতে চাইত না, কুমিল্লায় এলে মুরাদনগর যেতে চাইত না। ও চাইত বাবা-মাকে একসাথে পেতে। কুমিল্লায় গেলে পিয়ন কাম কুক আমির হোসেনের কাঁধে চড়ে বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, পেয়ারা গাছ থেকে পড়ে মাথা ফাটাত, জ্বরে পড়ে থাকত। আর কুমিল্লা এলে কাদেরের ছেলে টিউবওয়েল চাপত আর ও সারাদিন টিউবওয়েলের নিচে মাথা পেতে বসে থাকত । জ্বর হতো। সে এক দুঃসহ অবস্থা।

এর মাঝে ওর স্কুলের বয়স হলো। ও দুই জায়গায় দুই স্কুলে ভর্তি হলো। কুমিল্লার যে স্কুলে ভর্তি হলো সেটার প্রিন্সিপাল আমার ভক্ত, একজন অঙ্কনশিল্পী নাম নওশাদ কবীর। আর মুরাদনগরের স্কুলটা বাসার সামনেই। ইউএনও সাহেবেরই গড়ে তোলা। যেখানে যখন থাকত সেখানকার স্কুলে পড়ত। আর দুই অধ্যক্ষই বলত, খুব ভালো ছাত্র। ভালো লেখাপড়া করছে। ক্লাস শেষে পরীক্ষায় প্রথম হতো। আমি আশ্বস্ত ছিলাম।

একটা কলেজ ইলেকশনকে কেন্দ্র করে মন্ত্রীর বিরাগভাজন হলো লতিফ। মন্ত্রীর ধারণা লতিফ তাকে হারিয়ে দিয়েছে। মন্ত্রী সাহেব লতিফকে বদলি করে দিলেন প্রত্যন্ত এক উপজেলায়। ছোটো শিশু, একাধিকবার প্রত্যন্ত এলাকায় ইউএনওর চাকরি করেছে, এসব দোহাই দিয়ে বদলি করা হলো ঢাকায়। আমি একদিন মন্ত্রীর কাছে গিয়ে বললাম, 'আপনি অকারণে আমার স্বামীকে বদলি করলেন। এই ছোটো বাচ্চা নিয়ে আমি এখন থাকব কী করে! আমাকেও বদলি করে দেন।' তিনি আমার কথা শুনে

বললেন, 'হ্যা, ইউএনও সাহেব আমার দলকে হারিয়েছেন ঠিকই, তবে তিনি সৎ মানুষ, পণ্ডিত মানুষ, এটুকু করাই যায়।' তিনি আমাকে ঢাকায় বদলি করে দিলেন এবং কাকতালীয়ভাবে দুজনই সচিবালয়ে, অর্থ মন্ত্রণালয়ে।

ঢাকায় এসে প্রথমে মোহাম্মদপুরে একটা ভাড়া বাড়িতে থাকলাম কিছুদিন। পাশেই একটা কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করলাম পান্থকে । তখন বুঝিনি অবস্থা এত বেগতিক! বুঝলাম সোবহানবাগ অফিসার্স কলোনিতে আসার পর। সোবহানবাগ কলোনির স্কুলে পান্থকে ভর্তি করতে অসুবিধা হলো না। প্রিন্সিপাল ছিলেন লেখালেখির ভক্ত। তখন আমি দৈনিক কাগজে প্রচুর লিখতাম। আমার নাম উনি জানতেন। আমার ছেলে, বাবা-মা ম্যাজিস্ট্রেট, তাদের ছেলে কি আর খারাপ ছাত্র হতে পারে! এককথায় ভর্তি করে নিলেন। কোনো টেস্টও নিলেন না। কিন্তু তারপর থেকেই শুরু হলো বিপত্তি। হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় পান্থ সব সাবজেক্টে ফেল করল। পাস করল শুধু এক সাবজেক্টে। প্রিন্সিপাল আমাকে বার বার ডেকে পাঠান। আমি এড়িয়ে যাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, এবার ওর লেখাপড়াটা আমি নিজে দেখব। ফাইনালে ও সব সাবজেক্টে পাস করল, ফেল করল এক সাবজেক্টে। এবার নিজেই গেলাম প্রিন্সিপালের কাছে। ক্ষমা চেয়ে বললাম, 'আমার ছেলে যে লেখাপড়ায় এতটা খারাপ, ওর বেজ যে এত খারাপ ছিল আমি জানতাম না। কুমিল্লা আর মুরাদনগরে ও ক্লাসে প্রথম হতো। এখন বুঝতে পারছি, ইউএনওর ছেলে বলে ফার্স্ট বানানো হয়েছে। ওর এই ক্ষতিটা করা হয়েছে। বড়ো ক্ষতি হয়ে গেছে ম্যাডাম।' প্রিন্সিপাল হাসলেন। বললেন, 'না ও বেশ উন্নতি করছে। ঘাবড়াবেন না, ঠিক হয়ে যাবে।'

এরপর পান্থ ভর্তি হলো ধানমন্ডি বয়েজ স্কুলে, কোনো তদবির করতে হয়নি। পরীক্ষা দিয়ে নিজ যোগ্যতাতেই হয়েছে।

ছেলেবেলা থেকে ওর ছিল প্রবল শ্বাসকষ্ট। মাঝে মাঝেই ওর ফুসফুসের ওপর লেয়ার পড়ে যেত। ডাক্তাররা ঘোষণা দিতেন, '১২ ঘন্টা না দেখে কিছুই বলা যাচ্ছে না, ২৪ ঘন্টা না দেখে কিছুই বলা যাচ্ছে না।' শিশু হাসপাতালের বেডে ওর বুক হাঁপরের মতো ওঠানামা করত আর আমি চিৎকার করে কাঁদতাম। ওর বাবা কাঁদত লুকিয়ে। মাঝে মাঝে ডাক্তাররা স্ট্রাইক করত। একবার মনে আছে গভীর রাতে ওকে কাঁধে করে আমার এক ডাক্তার বন্ধুর বাসায় নিয়ে গিয়ে অক্সিজেন দিতে হয়েছিল। সে রাতে ওই বন্ধু না থাকলে ওর কী হতো আমি জানি না। বন্ধু সে রাতে দুঃখ করে বলেছিল, 'তোর ছেলেটা বেঁচে থাকবে । তবে কখনোই লিডার হতে পারবে না। সামনে যেতে পারবে না। অসুখের কারণে হীনম্মন্যতায় ভুগবে।' খুব কেঁদেছিলাম ওর

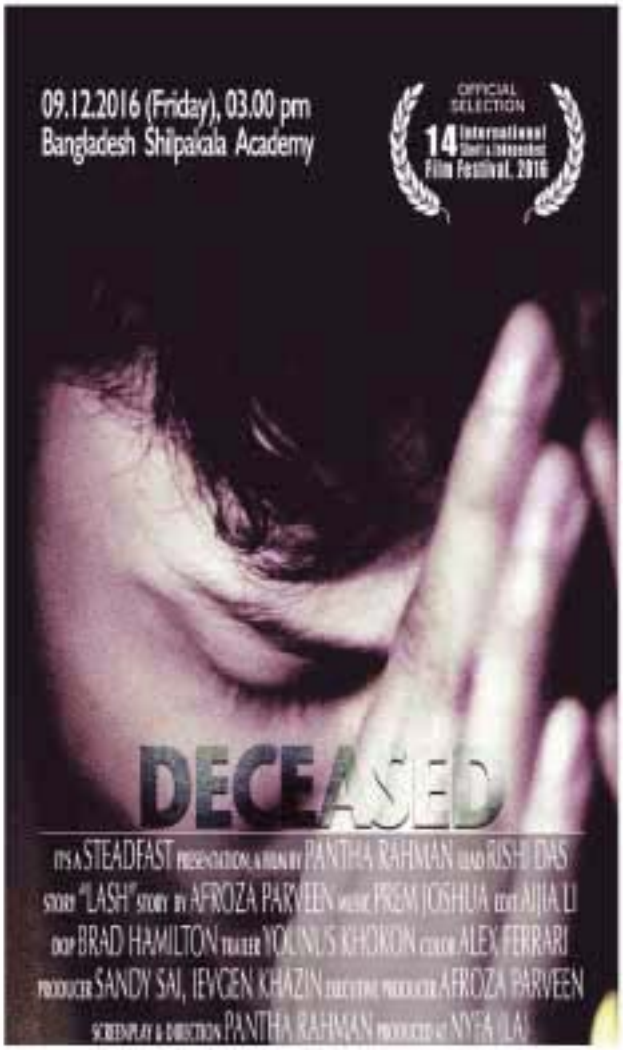

কথা শুনে। ছেলের অসুখের কষ্টে আর বন্ধুর মন্তব্যে। আজো মনে হলে খুব কষ্ট পাই।

ধানমন্ডি বয়েজে ভর্তি হবার পর পান্থ স্কাউটিং-এ জড়িয়ে পড়ল। আর আস্তে আস্তে ওর শ্বাসকষ্ট কমতে শুরু করল। একসময় ও স্কাউট ক্যাপ্টেন হলো। মাঝে মাঝেই চলে যেত জাম্বুরিতে। এরপর পান্থ শুরু করল ট্রেকিং। পর্বতে ওঠা ওর নেশার মতো হয়ে গেল। কেওক্রাডং দিয়ে যে ট্রেকিং এর শুরু হয়েছিল তা দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের পাহাড়গুলোতে নিয়ে গেল ওকে। সাথে সামাজিক কাজ তো ছিলই। ঢাকা শহরের আশপাশের সমস্ত এলাকায় গাছ লাগিয়েছে। স্বেচ্ছায় রক্ত দিয়েছে দিনের পর দিন। কক্সবাজারে গিয়ে 'কোস্টাল ক্লিন অ্যাপে' অংশ নিয়েছে বছর বছর। দেশের প্রতিনিধি হিসেবে বহুবার বিদেশে গেছে ও। ট্রেকিং-এ, পরিবেশের কাজে, সমাজ উন্নয়নের কাজে। বন্ধুর কথা মিথ্যে প্রমাণ করে সব জায়গাতেই ও লিডার হলো।

পান্থ যখন ক্লাস সেভেনে পড়ে আর একবার ধাক্কা খেলাম। একদিন গভীর রাতে এক ভদ্রলোক ফোন করে পান্থর টিচার পরিচয় দিয়ে জানালেন, পান্থ ৪২ দিন স্কুলে যায় না। আর এক যুগ্মসচিবের ছেলে সাদাব স্কুলে যায় না ৬৩ দিন। উনি বললেন, ওদের দুজনকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হবে। আমি বিশ্বাস করতে না চাইলে তিনি গিয়ে রেকর্ড দেখে আসতে বললেন। একথাও বললেন, ছেলে আপনার মাইনাস হয়ে গেছে। দেখেন হয়ত মাদক টাদক নিচ্ছে। আমার পাগলের মতো অবস্থা হলো। সেই গভীর রাতে ঘুমন্ত পান্থকে টেনে তুললাম। কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম কথা সত্যি কিনা। আমার এমন কণ্ঠস্বর ও কখনোই শোনেনি। গড়গড় করে বলল, 'হ্যা স্কুলে যাই না। টিচার অঙ্ক পারি না বলে খুব মারে। সাদাব আগে স্কুল পালিয়েছে। তারপর সাদাব আমাকে বলেছে। আমিও পালিয়েছি'।

'থাকিস কোথায় সারাদিন?'

'ধানমন্ডি লেকের ধারে।'

'বাথরুম পেলে কী করিস?'

'করি না।'

এবার ছেলের প্রতি রাগের সাথে সাথে প্রচণ্ড রাগ হলো টিচারের প্রতিও। এমন মারা মেরেছে যে ছেলে দুটো এই প্রচণ্ড রোদে না খেয়ে না বাথরুম করে লেকের ধারে বসে থাকে সারাদিন! বুঝলাম এ জন্যই আজকাল ছেলে বিকেলে বাসায় এসে মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করে। মা হিসেবে নিজেকে ব্যর্থ মনে হলো।

আমি সে রাতে একের পর এক আত্মীয়স্বজনকে জাগিয়ে তুলে একথা বলে বলে কাঁদতে লাগলাম। সে রাতে বাড়ির কেউ ঘুমাতে পারল না। পরদিন সকালে পান্থকে সাথে নিয়ে ওর বাবা আর আমার দুলাভাই গেলেন পান্থর স্কুলে। ওদিকে সাদাবকে নিয়ে ওর বাবাও গেলেন। হেডমাস্টার সেই টিচারকে

ডাকলেন। পান্থ হেডমাস্টারের সামনেই বলল উনি কীভাবে দিনের পর দিন মারধোর করতেন। আর সে কথা শুনে টিচার হেডমাস্টারের সামনেই পান্থর দুগালে এমন ঠাসঠাস করে চড় মারল যে ওর দুগালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেল। ওর বাবা প্রচণ্ড উত্তেজিত হলো। টিচারের বিরুদ্ধে মামলা করতে চাইল। পরে হেডমাস্টারের অনুরোধে আপোশ হলো। পান্থ আর সাদাবকে ওই স্কুলেই রাখা হলো। আর ওই টিচারকে পান্থদের ক্লাস থেকে অফ করা হলো। সেই অহংকারী নির্মম টিচার পান্থ আর ওর বাবার সামনে দম্ভোক্তি করে বলল, 'এই ছেলে যদি কোনোদিন এসএসসি পাস করে আর ওর যদি স্কাউটিং হয় তহলে আমার হাতের তালুতে লোম গজাবে।'

স্কুল শেষে পান্থ ভর্তি হয় ঢাকা কলেজে। কলেজ শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কলেজে পড়ার সময় থেকেই পান্থকে পেয়ে বসে ফটোগ্রাফির নেশায়। ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সাথে জড়িয়ে পড়ে। ওর তোলা ছবি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেতে থাকে। একসময় ঝুঁকে পড়ে মিডিয়ার দিকে। লেখাপড়ার পাশাপাশি অঞ্জন আইচ, অনিমেষ আইচের মতো পরিচালকদের সাথে কাজ করতে থাকে। জড়িয়ে যায় নানা প্রোডাকশন হাউসের সাথে। এরপর ও 'কে হতে চায় কোটিপতি' টিমের ফ্লোর ম্যানেজার হয়। মিডিয়া থেকে ও আর মুক্ত হতে পারে না। জড়িয়ে যায় আষ্টেপৃষ্ঠে, অস্থিমজ্জায়।

আমি জানি না, ওই শিক্ষকের হাতের তালুতে লোম গজিয়েছে কিনা, তবে জানি পান্থ প্রেসিডেন্টস স্কাউট হয়েছে। ঢাকা কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে। এসএসসি নয়, দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে ডিগ্রি নিয়েছে ।

চাকরির প্রতি কোনো আসক্তি ছিল না ওর । তাই ও পথে হাঁটেনি। একসময় গড়ে তোলে নিজের প্রোডাকশন হাউস 'স্টিডফ্লাস্ট'। বিজ্ঞাপনচিত্র, ডকুমেন্টারিসহ নানা ধরনের কাজ করতে থাকে। এরপর ওর ডাক আসে নিউইয়র্ক ফিল্ম একাডেমি থেকে । হলিউডের নিউইয়র্ক ফিল্ম একাডেমি থেকে ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া প্রেডাকশনস- এ মাস্টার্স করেছে ও। পান্থই প্রথম বাংলাদেশি ছাত্র যে নিউইয়র্ক ফিল্ম একাডেমি থেকে মাস্টার্স করল। মায়ের লেখা 'লাশ' গল্প নিয়ে 'ডিসিসড' নামে একটা স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি পরিচালনা করেছে। বিশ্বখ্যাত

মিউজিশিয়ান প্রেম জসুয়ার মিউজিক রয়েছে এ ছবিতে। ডিওপি (সিনেমাটোগ্রাফার) হলিউডের বিখ্যাত সিনেটোগ্রাফার ব্রাড হ্যামিলটন। হলিউডের 'ওয়ার্নার ব্রাদারস' স্টুডিওতে এ ছবি প্রদর্শিত হয়ে ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে। বাংলাদেশে দু-দুটি আন্তর্জাতিক ফেস্টিভ্যালে ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছে। ছবি প্রদর্শিত হয়েছে নেপালে। চলতি বছর প্রদর্শিত হবার জন্য নির্বাচিত হয়ে আছে নিউজিল্যান্ডে।

অনেক সোনালি সুযোগ ফেলে দেশ, মা-বোন আর বন্ধুদের টানে দেশপ্রেমিক পান্থ ফিরে এসেছে দেশে। স্টিডফাস্ট নামে তার একটা প্রোডাকশন হাউস রয়েছে । আছে নিজস্ব স্টুডিও আর প্যানেল। বিদেশের দুটো ফিল্ম ইন্সটিটিউটে অনলাইনে শিক্ষকতা করছে। পরিচালনা এবং সিনেমাটোগ্রাফি- দুদিকেই সমানভাবে কাজ করছে সে। লিখছে দুহাতে। পাশাপাশি চালিয়ে যাচ্ছে সমাজকর্ম।

আমি মাঝে মাঝে পান্থর দিকে তাকাই আর সবিস্ময়ে ভাবি, এই কি আমার সেই ছেলে, আমার আত্মজ! যে সারা বছর শ্বাসকষ্টে ভুগত! যে অঙ্ক না পেরে স্কুল পালিয়েছিল, যার শিক্ষক দম্ভ করে বলেছিল, ও এসএসসি পাস করলে আমার হাতের তালু দিয়ে লোম গজাবে! এ ছেলে কী করে ডিঙালো হিমালয়ের বিসিরয় পিক, জাপানের ফুঁজিয়ামা, কাশ্মীরের লাদাক! এ কথা তো ঠিকই স্পন্সর পেলে ও হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গটিও জয় করতে পারত। ভাবি, কী করে সাইকেলিং করল পুরো ভুটান! এই কী আমার সেই ছেলে যার কিছু হবে না মনে করে আমি লোন নিয়ে একটা বাড়ি করেছিলাম। ভেবেছিলাম কিছু না হলে এই বাড়ির ভাড়া তুলে তুলে ও খেতে পারবে।

আমার শুধু মনে হয়, মা ওর নাম রেখেছিল পান্থ আর ওর বাবা রেখেছিল সৌর। ওর মাঝে সমন্বয় ঘটেছে দুটোরই। ও এক চির পথিক, যে থামতে জানে না। আর ওর মাঝে আছে এক প্রবল প্রাণশক্তি যা ওকে থামতে দেয় না। আছে অদম্য ইচ্ছেশক্তি যা ওকে সামনে চালায়। শুধু আফসোস, যে দুজন এই সঠিক নামকরণ করেছিলেন তাঁরা আজ নেই।

পান্থ আমার ছেলে, আমি গর্বিত। আমি চাই ও সবার গর্ব হোক, দেশের গর্ব হোক। ওর জন্য সবার কাছে দোয়া চাইছি।

মায়ের কবিতা

তুমি মা আমার

আবুল হোসেন আজাদ

রাত নিঝুম চোখে নেই ঘুম একা জাগি বিছানায়
বেড়ে যায় রাত ঝিঁঝি পোকা ডাকে রাত জাগা পাখি গায়।
জোনাকির দল করে চলাচল আঁধারে আলো জ্বেলে
মনে হয় শুধু আমার শিথানে মাগো বুঝি তুমি এলে।

সেই তুমি গেছ আমারে রাখিয়া ছিলাম যখন ছোটো
কপালে ও গালে চুমুতে বলিতে বড়ো হয়ে খোকা ওঠো।
মানুষের মতো মানুষ হয়ে যে, মানুষেরে ভালোবেসো।
পরের দুঃখে হইও দুঃখী, দুঃখ তাদের নেশো।

তুমি আজ নেই তবু মনে পড়ে তোমার কত যে কথা
তোমার সে সব স্মৃতিরা ভাঙে হৃদয়ের নীরবতা।
হৃদয়ে আমার কুলু কুলু রবে বয়ে যায় একা নদী
সে নদীর বুকে আর কেউ নয় তুমি আছো নিরবধি।

মনে পড়ে আজ গোলাপের মতো তোমার সে মুখখানি
তুমি যে তুমিই তোমার মতন আর কেউ নয় জানি।
তুমি মা আমার পরম প্রিয় যে তুমি তো আমার প্রাণ
আমার জীবন আমার মরণ যত হাসি খুশি গান।

আমার প্রিয় মা

হামিদা খানম

দিনের আলোয় শপথ করে বলি
আমিই জানি আর কেউ জানে না
রক্তে আমার একটি নামই বহে
সবচেয়ে আপন আমার প্রিয় মা।

হামাগুড়ি কিংবা তারও আগে
আবছা আলোর ছোট্ট জগৎটাকে
দু-চোখ মেলে দেখছি যতবারই
চারপাশেতে দেখছি কেবল 'মা কে'।

কান্না, হাসির দিনগুলোতে একলা ছিলাম যখন
কেউ দেখেনি, কেউ বোঝেনি, কেউ ডাকেনি তখন
একটি মানুষ কেবল ছিল দু-চোখ দিয়ে চেয়ে
ভাবত কেবল ওযে আমার ছোট্ট সোনা মেয়ে।

এমনি করে আগলে রেখে কত
দিন কেটেছে, রাত হয়েছে ভোর
মা' যে কেবল মা-ই রয়ে গেছে
সবচেয়ে আপন আমার প্রিয় 'মা'।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ

মংছেনচীং মংছিন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একই সঙ্গে কবি, কথাশিল্পী, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোটো গল্পকার ও নাট্যাভিনেতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন একটি নাম যে নামে মুগ্ধতা আছে, আছে অদ্ভুত আকর্ষণ। তিনি বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ, ইংরেজি ১৮৬১ সালের ৭ মে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একা বহুগুণে গুণান্বিত। মোটকথা, বাংলা সাহিত্যের সব শাখায় আছে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি।

বাংলা সাহিত্যে অবদান

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বিহারী লালের লেখনীর মাধ্যমে বাংলা কবিতায় আধুনিকতার সূচনা হলেও রবীন্দ্রনাথের হাতেই তা পূর্ণতা পেয়েছে। একইভাবে রাজা মনমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে নেওয়া বাংলা পদ্যকে তিনি সমৃদ্ধের চূড়ায় পৌঁছে দেন। তাঁর হাতেই বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক উপন্যাস ও নাটকের জন্ম। তাঁর বৈচিত্র্যময় লেখনীর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে তিনি বিশ্ব আসনে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। অধিষ্ঠিত করেছেন বিরল মর্যাদার আসনে। সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে তিনি বিচরণ করেননি। কী সাহিত্যে, কী গানে সব ক্ষেত্রেই। তিনি ভাস্বর হয়ে আছেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

ছোটোগল্প কাবুলিওয়ালা, পোস্টমাস্টার, ছুটি, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, নাটক ইত্যাদি কিশোর মনে আজো সাড়া জাগায়। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে তিনি প্রথম এশীয় হিসেবে ১৯১৬ সালে সাহিত্যে 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন। বস্তুত তাঁর হাত ধরেই বাংলা সাহিত্য বিশ্বমানের স্বীকৃতি পায়। একবার হোসে অর্তেগা-ই-গাসেত যথার্থই বলেছিলেন— 'আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, অমলের মতো রাজার কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকেন।'

বিশ্বের দিকে চীন তার দুয়ার খুলে দেওয়ার পর সেখানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি তোং ইয়ুছান ওয়েলিমিং এবং ইয়াও ওয়েমিং নামের চীনা পণ্ডিত জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের রচনা সমগ্র চীনা ভাষায় শিগগির অনূদিত হবে।

ভালোবাসা ও গানের কবি নজরুল

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

ভালোবাসা ও গানের কবি ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। এই কবি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ সালের ২৪ মে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ ও মাতার নাম জাহেদা খাতুন। বাল্যকালে তাঁর পিতা মারা যান। এই কারণে তাঁর লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটে। বাড়ির পাশের মক্তবে নজরুল আরবি, ফারসি পড়েন। গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হন। বাংলা-ইংরেজি শেখেন। তাঁর মন ছিল খুব চঞ্চল। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন। খোশগল্প করতেন। লেটোর দল গঠন করেন। বাল্যকাল থেকে নজরুল কবিতা, গান ও গল্প লিখতেন। তিনি গান রচনা করতেন এবং নিজেই সুর দিতেন। গ্রামের বাড়িতে তাঁর মন টিকেনি।

সেখান থেকে চলে যান আসানসোলে। একটি রুটির দোকানে চাকরি নেন। সেখানে পরিচয় হয় এক পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে। পুলিশ কর্মকর্তার নাম কাজী রফিজ উদ্দিন। সেই পুলিশ কর্মকর্তা নজরুলকে সিমলায় নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন। কাজী রফিজ উদ্দিন একজন ধর্মভীরু লোক ছিলেন। তাই নজরুলের প্রতি তাঁর মায়া হলো। বালক নজরুলকে তিনি দরিরামপুর হাই স্কুলে ভর্তি করে দেন। লেখাপড়ার প্রতি নজরুলের তেমন মনোযোগ ছিল না। দশম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। হঠাৎ একদিন কাউকে না বলে নজরুল উধাও হয়ে যান। এই খবর শুনে কাজী রফিজ উদ্দিন হতাশ হন এবং খুব দুঃখ পান।

বালক নজরুল ছিলেন ভবঘুরে স্বভাবের। এক জায়গায় বেশিদিন তাঁর মন টিকেনি। কবিতা, গল্প, গান ও গজল লেখা ছিল তাঁর নিত্যদিনের সঙ্গী। সেই সময় কলকাতায় পত্রিকার সংখ্যা ছিল কম। কলকাতা থেকে নিয়মিত সওগাত পত্রিকা বের হতো। সওগাত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন। এ পত্রিকায় নজরুলের প্রথম কবিতা ছাপা হয়। তখন মুসলমানদের একমাত্র পত্রিকা ছিল এটি। কলকাতার রেডিওতে নজরুলের গান প্রচার করা হয়। নজরুলের কণ্ঠে গাওয়া গানের সেই রেকর্ড এখনো সংরক্ষিত আছে। বাংলাদেশ বেতার, টেলিভিশন এবং বিভিন্ন বেসামরিক টিভি চ্যানেলে নজরুলের জন্মজয়ন্তী ও মৃত্যুবার্ষিকীতে ওই রেকর্ড বাজানো হয়। নজরুল ছায়াছবিতেও অভিনয় করেছেন। সেই অভিনয়ের ক্যাসেট বাংলাদেশে এখনো পাওয়া যায়। নজরুল অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন যেমন- বিষের বাঁশী, অগ্নিবীণা, রিক্তের বেদন, বালুরচর ও ব্যথার দান উল্লেখযোগ্য।

নজরুলের গানের অনেক ক্যাসেট বের হয়েছে। তাঁর গানকে বলা হয় নজরুল গীতি। বিভিন্ন মুক্তির আন্দোলনে নজরুলের গান অগ্নিমন্ত্রের মতো কাজ করে। গোটা বাংলাদেশের গণ উদ্দীপনার অবলম্বন হয়েছিল নজরুলের গান ও কবিতা। বলাবাহুল্য, নজরুল অল ইন্ডিয়া রেডিওতে থাকাকালে বেতার-এর প্রয়োজনে সময়ের স্বল্পতায় তাঁকে মাত্র এক ঘণ্টায় ছয়টি প্রথম শ্রেণির গান রচনা করতে দেখা যায়। এই অদ্ভুত ক্ষমতা অনেক গীতিকারের মধ্যে দেখা যায় না। সংগ্রামের প্রয়োজনে নজরুল স্বদেশি গান রচনা করেছেন। বাংলা সঙ্গীতে ঐতিহ্যমণ্ডিত গজল গানের প্রবর্তক ছিলেন নজরুল। শুধু গজল নয়, তাঁর রচিত অনেক গান আরবি বা মিশরীয় সুরে রীতিমতো উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। নজরুল তাঁর গানে লঘু ছন্দ ও নৃত্য ছন্দ নির্বাচনেও অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতে যেমন–ভগবৎ প্রেম, মানবীয় প্রেম, ঋতু সঙ্গীত ও ক্রিয়া সঙ্গীত-এর ভিতর দিয়ে একটা বিশিষ্ট ঢং গড়ে উঠেছে– যাকে রবীন্দ্র ঢং বলা হয়ে থাকে। অদ্রূপ নজরুল গীতিরও বিশেষ ঢং আছে।

নজরুল সঙ্গীতভুবনে নতুন সুর সৃষ্টি করেছে। নজরুল যে সকল নতুন রাগ সৃষ্টি করেছেন সেগুলোর মধ্যে মঞ্জুরী, সন্ধ্যামালতী, ধন কুন্তলা, মীনাক্ষী, দোলনচাঁপা, বেনুকা, অরুণ ভৈরব, উদাসী ভৈরব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নজরুল প্রচুর ইসলামিক গান রচনা করেছেন।

তাঁর গানে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার মুসলমানগণ গানের জগতে প্রবেশ করে। মুসলমানদের মাঝে উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগে নজরুলের গানে। নজরুল বাঙালি মুসলমানদের আত্মশক্তির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বাংলা মঞ্চ ও ছায়াছবির গানেও নতুন বৈচিত্র্য এনেছেন। আধুনিক বাংলা গানের প্রবর্তনে নজরুলের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

এই কবি ১৯৪২ সালের ১০ জুলাই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বাকরুদ্ধ হন। কবিকে লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতাল ও রাঁচী মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। নজরুলকে সুচিকিৎসার জন্য লন্ডন ও জার্মানির ভিয়েনায় পাঠানো হয়। ডাক্তার নজরুলের রোগের 'পিকস ডিজিজ' বলে শনাক্ত করেন। এই রোগে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়। তা নিরাময়যোগ্য নয়। ১৯৭২ সালের ২৪ মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নজরুলকে সপরিবারে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। ধানমন্ডির ২৮ নং বাড়িটি বঙ্গবন্ধু নজরুলের নামে বরাদ্দ দেন, যা বর্তমানে নজরুল ইনস্টিটিউট নামে পরিচিত। বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় নজরুলকে পিজি হাসপাতালে (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল)-এ ভর্তি করা হয়। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট এই কবি সকলের মায়া ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জন্মদিনে আমাদের প্রত্যাশা, তিনি আমাদের যা দিয়ে গেছেন, তা যেন আমরা যুগ যুগ ধরে বুকে আগলে রাখতে পারি। তাঁর অবদান ভুলবার মতো নয়। বরং শ্রদ্ধাবনত চিত্তে জাতি আজীবন তাঁকে স্মরণ করবে।

ছুটি

নীহার মোশারফ

যদি ভাবি হাঁটছি আমি
সর্ষে ক্ষেতের ভেতর দিয়ে
ছুটছি দূরে অনেক দূরে
উড়ছি রঙের স্বপ্ন ডানায়
অনেক দিনের ছুটি নিয়ে
নেই ভাবনা দেখছি আকাশ
মনের ভেতর কুটুমপাখি
করছে নাচানাচি—
আমি আছি ঠাকুরবাড়ির
সাঁকোর কাছাকাছি।

বিদ্রোহী নজরুল

জসীম মেহবুব

কাঠবেড়ালি খায় পেয়ারা বায়না ধরে খুকি,
তাই দেখে এক দামাল কবি মারেন উঁকিঝুঁকি।
কৌতূহলী কবির মনে যায় গেঁথে সেই ছবি।
দিন-রাত্তির কাব্য করা ছিল যে তাঁর হবি।
কাব্য করেন ফুল পাখি আর সুয্যিমামার সাথে
স্বপ্নেতে হন প্রজাপতি গভীর কোনো রাতে।
সকালবেলার পাখি হতে কবির বড়ো শখ,
খুঁজে বেড়ান ঘুঘু শালিক ধবধবে সব বক।
জন্মেছিলেন জষ্ঠিমাসে আমপাকা এক ভোরে
জানান দিল ভোরের পাখি চুরুলিয়ার দোরে।
ছোট্ট খোকন সোনামনির বন্ধু ছিলেন তিনি
ঝাঁকরা চুলের সেই কবিকে আমরা সবাই চিনি।
বিশ্বভোড়া নাম লেখালেন বিদ্রোহী বুলবুল
শৈশবে নাম দুখুমিয়া খ্যাতিতে নজরুল।

কলম হাতিয়ার

মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ্ কায়সার

জন্মের পরে সুখ দেখেনি
পায়নি আদরটুকু
সেই আমাদের প্রাণের কবি
ডাক নাম তাঁর দুখু।

দুঃখ যে তাঁর সঙ্গী ছিল
যায় কি কিছু করা
সারাদিনের কাজের পরে
শিখত পুথির পড়া।

পুঁথি তাঁকে পথ দেখাত
কলম ধরায় হাতে
দুখুর তখন ছন্দ ছড়ায়
আনন্দে মন মাতে।

তারপরে তাঁর সামনে চলা
তাকাননি আর পিছু
অত্যাচারীর ভীত কাঁপিয়ে
লিখেন অনেক কিছু।

লেখনি যার শক্তিশালী
পাত্র কি দমবার
দিনে দিনে বিদ্রোহী রূপ
কলম হাতিয়ার।

ত্যাগ ও বীরত্বের সাক্ষর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মোস্তফা হোসেইন

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ যুগের পর যুগ মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালের ২২ মার্চ। তখন ছিল ঢাকার সেগুনবাগিচার একটি ভাড়া বাড়িতে। প্রয়োজনের তুলনায় জায়গাটা ছিল ছোটো। জাতীয় এই প্রতিষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত নিজস্ব ভবনে স্থানান্তর হয় গত ১৬ এপ্রিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার আগারগাঁও-এ জাদুঘরের উদ্‌বোধন করেন।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-ঐতিহ্যের উপকরণ ও দলিলাদি নিয়ে এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার ফলে একাত্তরের বীরত্ব গাথা ও ত্রিশ লাখ শহিদের আত্মত্যাগের প্রমাণসমূহ দেখার সুযোগ পাবে যে কেউ। গবেষকগণও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে গবেষণা করতে পারবেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের মুক্তিযুদ্ধ কিংবা স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর জাদুঘর আছে। তবে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে আমাদের এই জাদুঘরটি বিশেষ জায়গা করে নিতে পেরেছে। ঢাকার আগারগাঁও-এ প্রায় আড়াই বিঘা জায়গার উপর জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠিত। ভবনের সামনে দিয়ে গেলেই মনে হতে পারে ভবনটিই যেন মুক্তিযুদ্ধের স্মারক। ভিতরে ঢুকলে ছোটো পরিসরে সবুজ চত্বর। তারপর চোখে পড়বে মূল জাদুঘরের ভিতরের অংশগুলো।

জাদুঘরটি সাজানো হয়েছে ৪টি গ্যালারিতে। প্রথম গ্যালারিতে ঐতিহ্য ও ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় আছে। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারির পূর্ব পর্যন্ত ইতিহাসের বিভিন্ন দিক দেখা যাবে প্রথম গ্যালারিতে। দ্বিতীয় গ্যালারিতে আছে ৩ জানুয়ারি ১৯৭১ থেকে এপ্রিলের ৩০ তারিখ পর্যন্ত। তৃতীয় গ্যালারিতে ১ মে থেকে ১৯৭১ সালের ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত। চতুর্থ গ্যালারিতে ১৯৭১ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বরের বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন ও দলিলপত্র।

জাদুঘরের গ্রন্থাগারটি কয়েক মাস আগেই আগারগাঁও-এ স্থানান্তর হয়েছে। মনোরম পরিবেশে এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহ উল্লেখ করার মতো। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর ইতিহাস বিষয়ে প্রকাশিত বইয়ের এত বড়ো সংগ্রহ আর কোথাও নেই। গবেষকগণ এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় ভূমিকা রাখতে পারবেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শুধু যুদ্ধস্মারক প্রদর্শনী ও সংরক্ষণেই তাদের কাজ সীমাবদ্ধ রাখেনি। মুক্তিযুদ্ধ ও আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্যও জাদুঘরটি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উদ্দেশ্য– নাগরিকদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ

গঠনের প্রেরণা সৃষ্টি। এই কাজে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় শিশু-কিশোরদের। কারণ আগামী দিনে তারাই এই দেশের নাগরিক ও তাদের দ্বারাই দেশ ও সমাজ শাসিত হবে।

এই লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে আউটরিচ নামে একটি কর্মসূচি চালু হয়েছে। এর মাধ্যমে ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জাদুঘরে আনা হয়। তাদের 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস' নামের একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়। তারপর তারা গ্যালারিসমূহ ঘুরে দেখে। গাইড থাকে তাদের সঙ্গে। তিনি গ্যালারিতে থাকা স্মারকগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে তাদের বুঝিয়ে দেন। গ্যালারি ঘুরে দেখা শেষ হলে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় তাদের জন্য। একই সঙ্গে আলোচনাও থাকে। এই কর্মসূচির আওতায় জাদুঘরটি প্রথম ১২ বছরেই ১ লাখ ২২ হাজার শিক্ষার্থীকে জাদুঘরে সংশ্লিষ্ট করেছে।

সাধারণত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসে মানুষ স্মারক ও দলিলপত্র দেখার সুযোগ পায়। জাদুঘরের কর্মসূচিও ভবনকেন্দ্রিক হয়। অন্তত আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এমনই হয়ে থাকে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এক্ষেত্রে ভিন্নতর। ঢাকার বাইরের শিশু-কিশোররাও যাতে জাদুঘরের সুবিধা পায় সেদিকেও দৃষ্টি দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃপক্ষ। ভ্রাম্যমান জাদুঘরের মাধ্যমে সেই সুযোগটি ঢাকার বাইরের শিশু-কিশোররা পেয়ে থাকে। বড়ো একটি গাড়িতে জাদুঘরের স্মারকগুলোর রেপ্লিকা প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকে। সেই গাড়িটি ঢাকার বাইরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যায়। শিক্ষার্থীরা স্মারকগুলো দেখে এবং আলোচনা ও কুইজে অংশ নেয়। ভ্রাম্যমান জাদুঘর ২০০১ সালে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। ২০০৩ পরবর্তী ৭ বছরে তারা ৬৩৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাড়ে ৩ লাখ শিক্ষার্থীকে জাদুঘর দেখানোর সুযোগ করে দিতে পেরেছে।

শিশু-কিশোরদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কৌতূহলী করার পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের মুখ থেকে তাদের যুদ্ধকথা শোনার একটি কর্মসূচিও আছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের। একইভাবে একাত্তরের অভিজ্ঞতার কথা তারা পরিচিতদের মুখ থেকে শুনে তা লিখে জাদুঘরে জমা দিতে পারছে। সেক্ষেত্রে আজকের শিশু-কিশোর প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে সরাসরি একাত্তর সম্পর্কে জানার সুযোগ পাচ্ছে। তারা সেগুলো লিখে জাদুঘরকে দিচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের এমন বর্ণনা (২০১০ সাল) ১৬ হাজারের বেশি জমা হয়েছে। যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে। আর এই বিশাল কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারছে আমাদের শিশু-কিশোররা।

আমরা জানি, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দেশের বিভিন্ন স্থানে, বধ্যভূমিতে এনে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এই বধ্যভূমিগুলো সংরক্ষণ ও সেখানে স্মৃতিসৌধ নির্মাণে কাজ করছে সরকার। উদ্দেশ্য সেখানকার নৃশংসতা সম্পর্কে আগামী নাগরিকদের অবহিত করা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরও তাদের কাজের মধ্যে এই বধ্যভূমিগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। শুধু তাই নয়, যেসব দেশ যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সেসব দেশের বধ্যভূমিগুলো সম্পর্কে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার কাজও করছে তারা।

বিশেষজ্ঞদের মতামত ও গবেষণালব্ধ তথ্য সংগ্রহ ও সেগুলো সারা বিশ্বের মানুষকে জানানোর কাজও করছে জাদুঘর। এই প্রক্রিয়ায় তারা বিভিন্ন সময় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেসব সিদ্ধান্ত বিভিন্ন দেশে সংশ্লিষ্টদের জানানো হয়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের দেশের ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর সদস্যরা। তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে জামায়াতে ইসলামি, মুসলিম লীগ, পিডিপি ও নেজামে ইসলামি নামের দলীয় নেতা কর্মীরা। তারা নিজেরাও নৃশংসতায় অংশ নিয়েছে। মানবতাবিরোধী এসব অপরাধীদের আইনানুগ বিচার করার কাজেও এসব মতামত সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

শিশু-কিশোর বন্ধুরা যদি চায় তাহলে তারাও জাদুঘরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। খুব সহজ। তারা জাদুঘরে যোগাযোগ করে স্বেচ্ছায় কাজ করার কথা জানাবে। স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা এই সুযোগ পায়।

জাদুঘরে প্রবেশ করতে গেলে ২০ টাকা প্রবেশমূল্য দিতে হয়। কিন্তু আউটরিচ কর্মসূচিতে দর্শনার্থীরা বিনামূল্যে জাদুঘর দেখার সুযোগ পায়। রবিবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে এ জাদুঘর। জাদুঘর দেখা, পাঠাগার ব্যবহার করতে করতে ক্লান্তি এসে গেলে ক্যাফেটেরিয়ায় এক কাপ চা খাওয়ার সুযোগ আছে। ইতিহাসকে জানতে, বাংলাদেশকে জানতে, এমন সুন্দর সুযোগ সবাই গ্রহণ করতে পারে অনায়াসে।

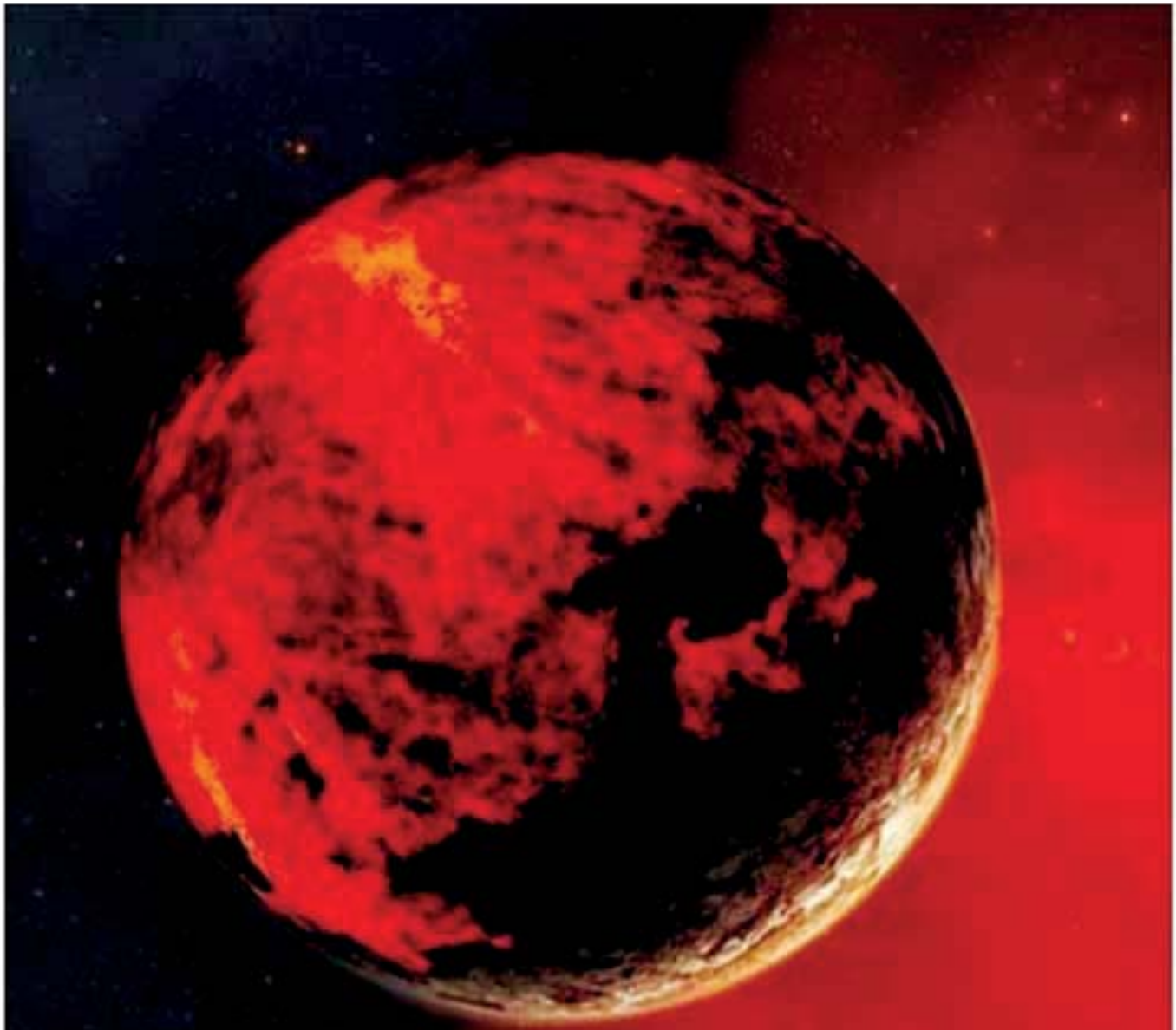

মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যে

সানাউল্লাহ আল-মুবীন

শেষের কবিতা। বাংলা সাহিত্যের একটি আধুনিক উপন্যাস। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই উপন্যাসের নায়কের নাম অমিত। নায়িকা আছে দুজন: লাবণ্য ও লিলি। গঙ্গা নদীর ধারে পিকনিক করতে গিয়ে অমিত লিলিকে একবার বলেছিল: 'লিলি, কোটি কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে আমাতে মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় তার কোনো একটা হাজার ক্রোশী খালের ধারে মুখোমুখি দেখা হয়, ... ।'

মঙ্গলগ্রহ সূর্যের চতুর্থ গ্রহ। সন্ধ্যেবেলা আকাশের পশ্চিমদিকে তাকালে কখনো কখনো একটি লাল তারাকে সকলের আগে ফুটে উঠতে দেখা যায়। এটাই মঙ্গলগ্রহ। এই গ্রহ সূর্য থেকে প্রায় বাইশ কোটি কিলোমিটার দূরে রয়েছে। পৃথিবীর দেড়গুণ। আমাদের দ্বিতীয় কাছের গ্রহ এটি। শুক্রগ্রহের পরেই এর অবস্থান। সূর্যের চারপাশের একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘোরে এই গ্রহ। পৃথিবীও তাই। কিন্তু পৃথিবী ঘোরে ৩৬৫ দিনে একবার, মঙ্গল ৬৬৯ দিনে, পৃথিবীর হিসেবে ৬৮৭ দিনে। তাই প্রতি দুবছর দুমাস পর পর কক্ষপথে পৃথিবী মঙ্গলগ্রহকে অতিক্রম করে যায়। তখন পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব নেমে আসে মোটামুটি সাড়ে পাঁচ কোটি কিলোমিটারে। আবার মঙ্গল যখন পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে চলে যায়, সূর্যের ওপারে, তখন এই দূরত্ব বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় চল্লিশ কোটি কিলোমিটার।

মঙ্গলগ্রহের আকার পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক। ভর পৃথিবীর দশ শতাংশের কিছুটা বেশি। সূর্য থেকে দূরে আছে পৃথিবীর তুলনায় প্রায় দেড়গুণ। এর দিনরাত পৃথিবীর প্রায় সমান, চব্বিশ ঘণ্টা সাঁইত্রিশ মিনিট। বছর প্রায় দুগুণ। পৃথিবীর তুলনায় সূর্য থেকে দূরে রয়েছে বলে এর পরিবেশ যথেষ্ট ঠান্ডা। প্রায় সারা বছরই তাপমাত্রা থাকে বরফ জমার নিচে। শুধু গ্রীষ্মের দুপুরে কিছুটা ওপরে ওঠে বিষুবপ্রদেশে। এর একটি পাতলা বায়ুমণ্ডল আছে, তার প্রধান উপাদান কার্বন-ডাই-অক্সাইড। এছাড়া আছে কিছু নাইট্রোজেন, আর্গন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও সামান্য জলীয় বাষ্প। বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের প্রায় একশত ভাগের একভাগ।

কক্ষপথে প্রতি দুবছর দুমাস পর পর পৃথিবী মঙ্গলগ্রহকে অতিক্রম করে যায়। এই ঘটনাকে বলে প্রতিযোগ। এ সময় মঙ্গল পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসে। কিন্তু মঙ্গলের কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের তুলনায় একটু বেশি লম্বাটে বলে প্রত্যেক প্রতিযোগের সময় দুটো গ্রহ সমান কাছে আসে না। পৃথিবী সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরের এবং মঙ্গল সবচেয়ে কাছের অবস্থানে থেকে যদি প্রতিযোগ অর্থাৎ কক্ষপথে দুটো গ্রহের সাক্ষাৎ ঘটে, তবে তাদের মধ্যে দূরত্ব সবচেয়ে কম হয়। এ সময় মঙ্গল চলে আসে পৃথিবীর সাড়ে পাঁচ কোটি কিলোমিটারের মধ্যে। দুটো গ্রহ এমন অবস্থানে আসে পনেরো থেকে সতেরো বছরে। সূর্য, চন্দ্র ও শুক্রগ্রহের পরে মঙ্গল তখন হয়ে ওঠে পৃথিবীর আকাশের চতুর্থ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। আবার পৃথিবী সূর্য থেকে সবচেয়ে কাছের এবং মঙ্গল সবচেয়ে দূরের অবস্থানে থেকে যদি কক্ষপথে দুই গ্রহের সাক্ষাৎ ঘটে, তখন তাদের মধ্যে দূরত্ব থাকে দশ কোটি কিলোমিটারের কিছু বেশি। অর্থাৎ দুই গ্রহের কাছাকাছি অবস্থানের মধ্যেও ব্যবধান প্রায় পাঁচ কোটি কিলোমিটারের।

পৃথিবীর মতো মঙ্গলও কাত হয়ে আছে তার অক্ষতলে। এর পরিমাণ পঁচিশ ডিগ্রি। পৃথিবী সাড়ে তেইশ। ফলে মঙ্গলগ্রহেও ঋতুর বদল হয়। কিন্তু মঙ্গল যেহেতু সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর তুলনায় বড়ো কক্ষপথ নিয়ে ঘোরে, তাই এ ঋতুর দৈর্ঘ্য পৃথিবীর চেয়ে বেশি। মঙ্গল যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে চলে আসে, তখন সূর্য থেকে তার দূরত্ব কমে হয় প্রায়

গ্যালিলিও

বিশ কোটি কিলোমিটার। এই সময় তার দক্ষিণ গোলার্ধে হয় গ্রীষ্মকাল, আর উত্তর গোলার্ধে শীতকাল। এই অবস্থা বেশিদিন থাকে না। কারণ এই সময় মঙ্গল সূর্যের কাছে বলে কক্ষপথে তার গতিবেগ বেশি। আবার মঙ্গল যখন সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে চলে যায়, তখন দূরত্ব বেড়ে দাঁড়ায় পঁচিশ কোটি কিলোমিটারে। এই সময় উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল। এই অবস্থা তুলনামূলকভাবে স্থায়ী হয় দীর্ঘকাল। কারণ তখন মঙ্গল সূর্য থেকে দূরে বলে কক্ষপথে সে চলেও ধীর লয়ে।

মঙ্গল একটি হালকা গ্রহ। এর অভিকর্ষ (কোনো বস্তুকে কাছে টানার জোর) পৃথিবীর অভিকর্ষের তিনভাগের একভাগ। অর্থাৎ পৃথিবীতে যে বস্তুর

ওজন তিন কিলোগ্রাম, মঙ্গলে তার ওজন মাত্র এক কিলোগ্রাম। পৃথিবীর ক্ষেত্রে পলায়নবেগ (পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাশূন্যে বেরিয়ে যাওয়ার বেগ) যেখানে সেকেন্ডে এগারো কিলোমিটারের বেশি, মঙ্গলে সেটা পাঁচ কিলোমিটার। অর্থাৎ কোনো বস্তু সেকেন্ডে পাঁচ কিলোমিটার বেগে উড়াল দিতে পারলে মঙ্গলের মাটি তাকে আর টেনে নামাতে পারবে না।

মঙ্গলগ্রহ বিখ্যাত তার লাল রঙের জন্য। প্রাচীন গ্রিক ও রোমানরা একে নাম রেখেছিল তাদের যুদ্ধের দেবতার নামে। এর বেশির ভাগ জায়গা লাল ধুলোমাটিতে ঢাকা। লালচে রঙের ধুলোর কারণে এর আকাশও লাল-খয়েরি, কখনো কোমল গোলাপি। কখনো গোলাপি আকাশে ভাসে শাদা মেঘের ভেলা। এর আকাশে ওঠে দুটো চাঁদ। একটির নাম ফোবোস, অর্থ ত্রাস। অন্যটির নাম ডিমোস, অর্থ ভয়। এগুলো গ্রিকদের যুদ্ধের দেবতার গাড়ির দুটো ঘোড়ার নাম। এরা মঙ্গলের উপগ্রহ। পৃথিবীর যেমন চাঁদ। ফোবোস আকারে বড়ো। লম্বায় প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার, চওড়ায় বিশ। এটি মঙ্গলের মাটির মাত্র ছ'হাজার কিলোমিটার ওপর দিয়ে ঘোরে। উদিত হয় পশ্চিমে, অস্ত যায় পুবে। মঙ্গলের আকাশে এটি দিনে ওঠে তিনবার। ডিমোস ছোটো: লম্বায় প্রায় পনেরো কিলোমিটার, চওড়ায় দশ। এটি মাটির প্রায় বিশ হাজার কিলোমিটার ওপর দিয়ে ঘোরে। উদিত হয় পুবে, ডোবে পশ্চিমে। আমাদের চাঁদের মতো। ফোবোস শুকতারার চেয়ে খানিকটা বেশি উজ্জ্বল, ডিমোস প্রায় সন্ধ্যাতারার মতো।

মঙ্গলগ্রহকে দুরবিনের নলের ভেতর দিয়ে প্রথম দেখেন গ্যালিলিও ১৬১০ সালে। তিনি দেখেন, এর ভিতরে আমাদের চাঁদের মতো রয়েছে কণা। দিনে দিনে তা বড়ো হয়, আবার ছোটো হয়। ১৬৫৯ সালে ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্‌স এর গায়ে কিছু কালো দাগ দেখতে পান। ১৬৭২ সালে তিনি আবিষ্কার করেন। মঙ্গলের দক্ষিণমেরু বরফের টুপি পরা। ১৭৮৪ সালে উইলিয়াম হারশেল মঙ্গলগ্রহ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে এর উত্তরমেরুতেও বরফের টুপির খোঁজ পান। তিনি দেখতে পান, বিভিন্ন ঋতুতে এই মেরুটুপি যথেষ্ট বড়ো ও ছোটো হয়। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত নেন, মঙ্গলের মেরুটুপি জমাটবাঁধা পানিতে তৈরি।

উনিশ শতকের শেষদিকে এই গ্রহকে নিয়ে অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনি তৈরি হয়েছিল। খ্যাতনামা ব্রিটিশ বিজ্ঞান-কল্পকাহিনি লেখক এইচ জি ওয়েল্‌স-এর বই

মঙ্গলগ্রহ বিখ্যাত তার লাল রঙের জন্য। প্রাচীন গ্রিক ও রোমানরা একে নাম রেখেছিল তাদের যুদ্ধের দেবতার নামে। এর বেশির ভাগ জায়গা লাল ধুলোমাটিতে ঢাকা। লালচে রঙের ধুলোর কারণে এর আকাশও লাল-খয়েরি, কখনো কোমল গোলাপি। কখনো গোলাপি আকাশে ভাসে শাদা মেঘের ভেলা। এর দেশে আকাশে ওঠে দুটো চাঁদ। একটির নাম ফোবোস, এর অর্থ ত্রাস। অন্যটির নাম ডিমোস, অর্থ ভয়।

দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৭ সালে। এই বইয়ে মঙ্গলগ্রহ বসবাসের অনুপযোগী হয়ে যাওয়ায় বুদ্ধিমান প্রযুক্তিতে উন্নত মঙ্গলবাসীদের পৃথিবী অধিকার করতে আসার কাল্পনিক বিবরণ ছিল। ১৯৩৮ সালে রেডিওতে এর নাট্যরূপ প্রচারিত হলে বহু মানুষ ভীত হয়ে পড়েছিল এই ভেবে যে, মাঙ্গলিকরা সত্যি-সত্যিই পৃথিবী আক্রমণ করতে আসছে।

রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটি লেখেন, তখন মঙ্গলগ্রহের খালের গল্প বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। ১৮৭৭ সালে মঙ্গল যখন পৃথিবীর খুব কাছাকাছি আসে, তখন গিওভান্নি শিয়াপারেল্লি নামে ইতালি দেশের এক বিজ্ঞানী একটি শক্তিশালী দুরবিন দিয়ে একে পর্যবেক্ষণ করেন। তার গায়ে তিনি সরলরেখার মতো কিছু কালো দাগ দেখতে পান। এর আগে ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্‌স যেমন দেখেছিলেন। মঙ্গলের লাল মরুভূমির ওপর কালো দাগগুলো এঁকে তিনি এর একটি বড়ো মানচিত্র তৈরি করেন। তিনি সেই দাগগুলোর নাম দেন 'কানালি'।

'কানালি' ইতালীয় ভাষার শব্দ। এর অর্থ খাঁজ। কিন্তু ইংরেজিতে এটি হয়ে উঠল 'ক্যানেল', যার অর্থ খাল। এই সময় ইউরোপ ও আমেরিকা মেতে উঠল মঙ্গলগ্রহের খালের গল্প নিয়ে। এর তোড়ে ভেসে গেলেন পারসিভাল লাওয়েল নামের এক আমেরিকান

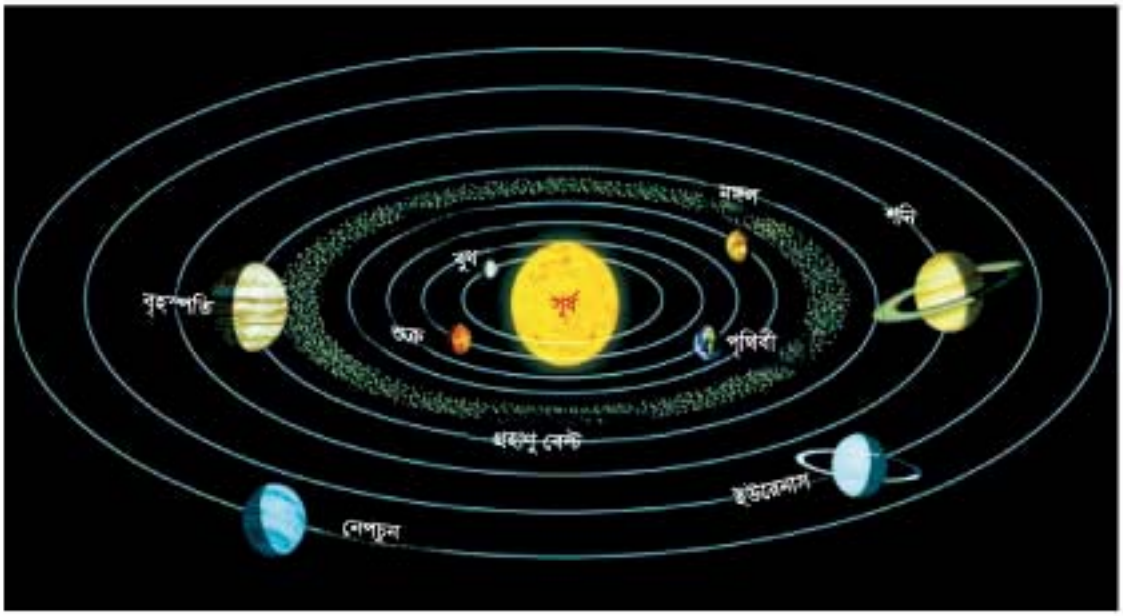

বিজ্ঞানী। তিনি চমৎকৃত হলেন শিয়াপারেল্লির আবিষ্কারে। ১৮৯৪ সালে মঙ্গল যখন আরও একবার পৃথিবীর খুব কাছাকাছি আসে, তখন এই সৌখিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী একটি মানমন্দির বানালেন একে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে। তিনি এর পিঠের বৈশিষ্ট্যগুলোর ছবি আঁকলেন, বিশেষ করে খালগুলোর। তৈরি করলেন একটি বিস্তারিত মানচিত্র। তিনি বললেন, মঙ্গলে বাস করে বুদ্ধিমান ও উন্নত এক প্রজাতি। তারাই কেটেছে এসব খাল, যা মরুঅঞ্চলের বরফগলা পানি বয়ে আনে বিষুব-অঞ্চলের ঊষর মরুভূমিতে চাষাবাদের জন্যে, পিপাসার্ত শহুরে অধিবাসীদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে। তাঁর মতে, গ্রহময় তরল পানির সরবরাহ নিশ্চিত করে এসব খাল। মানচিত্রে গাঢ় রঙের কিছু ছোপ এঁকে তিনি বললেন, এগুলো মঙ্গলের ঘন গাছপালায় ঢাকা অরণ্য।

অন্য কোনো বিজ্ঞানী দুরবিনে তাকিয়ে মঙ্গলের পিঠে খাল দেখেননি, দেখেননি অরণ্য। কিন্তু তবুও জনপ্রিয় হয়ে উঠল শিয়াপারেল্লি ও লাওয়েলের মতামত। তাদের কানালি আর গাঢ় ছোপ শেষের কবিতা নামের একটি বাংলা উপন্যাসের নায়কের মুখে হয়ে উঠল 'হাজার-ক্রোশি খাল' আর 'লাল অরণ্য'। অমিতের মুখে কোটি-কোটি যুগের পরে লিলির সঙ্গে দৈবাৎ তার দেখা হওয়ার আশাবাদ ছিল 'মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় তার কোনো-একটা হাজার-ক্রোশি খালের ধারে'। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আজ মঙ্গলে গবেষণা যান পাঠিয়ে জেনেছেন, ওখানে লাল অরণ্য নেই, হাজার ক্রোশি খালও নেই, নেই কোনো বুদ্ধিমান এমন কী এককোশি প্রজাতিও। আছে ধুলো ও পাথর ছড়ানো বিস্তীর্ণ লাল মরুভূমি, বালিয়াড়ি, উঁচু পাহাড়, বিশাল উপত্যকা, আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ, লম্বা গিরিখাত, ভয়াল হাঁ-করা গর্ত, বড়ো-বড়ো পাথর।

মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশে মহাকাশে প্রথম ডানা মেলে মার্কিন বিজ্ঞানীদের মেরিনার প্রকল্পের একটি নভোযান। ১৯৬৫ সালের ১৪ জুলাই মেরিনার-৪ নামের এই মহাকাশযান গ্রহটির উপরিতলের প্রায় দশহাজার কিলোমিটার ওপর দিয়ে উড়ে যায়। এর চার বছর পর, ১৯৬৯ সালের ৩১ জুলাই ও ৫ আগস্ট মেরিনার-৬ ও মেরিনার-৭ উড়ে যায় মঙ্গলের পিঠের মাত্র তিন হাজার কিলোমিটার ওপর দিয়ে। এসব নভোযান মঙ্গলগ্রহের কিছু আলোকচিত্র তুলে পাঠায়। দেখা যায়, মঙ্গলের উপরিতল অসংখ্য হাঁ-করা গর্তে ভরা, চাঁদের মতো।

১৯৭১ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্স-২ ও মার্স-৩ নামে দুটো গ্রহ যান প্রথম নোঙর ফেলে মঙ্গলের বন্দরে। দুটো গ্রহযানই সফলভাবে নামে মঙ্গলের মাটিতে। মার্স-৩ পৃথিবীতে পাঠায়

মঙ্গলের বিশ সেকেন্ড দৈর্ঘ্যের একটি টেলিভিশন চিত্র। একই বছর মেরিনার-৯ হয়ে ওঠে মঙ্গলগ্রহের প্রথম মারকিন কৃত্রিম উপগ্রহ। মঙ্গলের মাটির মাত্র বারোশত কিলোমিটার ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে যানটি এর সাত হাজারেরও বেশি আলোকচিত্র তুলে পাঠায়। পৃথিবীর মানুষ দেখল অনেক দূরের একটি গ্রহের শুকনো, আঁকাবাঁকা, শাখা প্রশাখাওয়ালা পাহাড়ি নদী ও খালের মতো ভূমিরূপ। আমরা জানতে পারলাম, সৌরজগতের সবচেয়ে উঁচু পর্বত আমাদের এভারেস্ট নয়, এটি রয়েছে মঙ্গলগ্রহে। গ্রিক দেবতাদের আবাসস্থলের নামে এর নাম রাখা হয় অলিমপাস। মঙ্গলের সমতলভূমি থেকে এর উচ্চতা পঁচিশ কিলোমিটারেরও বেশি, তিনটি এভারেস্টের সমান। মেরিনার-৯ আরও জানালো- ব্যাপক ধুলোর ঝড় ওঠে মঙ্গলে, যার বেগ হতে পারে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় পাঁচশ কিলোমিটার।

১৯৭৬ সালে মার্কিন বিজ্ঞানীদের জোড়া গবেষণা যান ভাইকিং-১ ও ভাইকিং-২ গিয়ে নামে লাল এই গ্রহটির বুকে। জানা যায়, এর বায়ুমণ্ডল গঠিত হয়েছে প্রধানত কার্বন-ডাই-অক্সাইড দিয়ে, উপরিতল গড়া লাল ধুলোমাটি দিয়ে, যার প্রধান দুটো উপাদান হচ্ছে সিলিকন ও লোহা। এছাড়া রয়েছে সামান্য অক্সিজেন, অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালশিয়াম, সালফার প্রভৃতি। এখানে-ওখানে রয়েছে ছোটো-বড়ো নানা চেহারার প্রচুর পাথরখণ্ড, বেশির ভাগেরই রং লাল। বিরাট হাঁ-ওয়ালা গর্ত, হিমবাহ, জোলো বরফ, এককালে যে এর নদীতে-খালে পানির বান ডাকত তার স্পষ্ট চিহ্ন, মরা আগ্নেয়গিরি, বিশাল উপত্যকা, পাথর-ছড়ানো লাল মরুভূমি ইত্যাদি এবং কখনো হালকা খয়েরি-লাল, কখনো কোমল গোলাপি রঙের আকাশের প্রচুর আলোকচিত্র পৃথিবীতে পাঠায় ভাইকিং।

১৯৯৭ সালের ৪ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসে মার্কিন বিজ্ঞানীরা মঙ্গলগ্রহের পিঠে নামান সোজারনার নামের ছয় চাকার একটি ছোট্ট গাড়ি, যা পাথ-ফাইনডার নামক আকাশতরি বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সোজারনার ঘুরে বেড়িয়েছে মঙ্গলের ধুলোমাটিতে, করেছে নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কাজ, রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেছে এর পাথরের, প্রায় সতেরো হাজার আলোকচিত্র পাঠিয়েছে মঙ্গলের দেশের। জানা গেছে, পৃথিবী থেকে লাল দেখা গেলেও মঙ্গল আসলে এক রূপকথার দেশ। সেখানে রয়েছে লাল, নীল ও সাদা রঙের অসংখ্য পাহাড়।

এরপর আরও গ্রহ যান উড়ে গেছে মঙ্গলের দিকে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে জাপানের নোজোমি, যুক্তরাষ্ট্রের মার্স গ্লোবাল সারভেয়ার, মার্স ওডিসি, স্পিরিট, অপরচুনিটি, কিওরিউসিটি ও ফিনিক্স, ইউরোপের মার্স এক্সপ্রেস ও মার্স অরবিটার, ভারতের মঙ্গলযান প্রভৃতি। এদের কোনোটি কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত হতে ব্যর্থ হয়েছে, কোনোটি কৃত্রিম চাঁদ হয়ে ঘুরেছে বছরের পর বছর, কোনোটি গিয়ে নেমেছে মঙ্গলের মাটিতে, নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কাজ চালিয়েছে। এসব অভিযান থেকে পাওয়া গেছে মঙ্গলের ভৌগোলিক নানা তথ্যসংবলিত সম্পূর্ণ মানচিত্র। জানা গেছে, মঙ্গলে নিয়মিত ঋতুর বদল হয়, জলীয় বাষ্প সঞ্চারিত হয় এক গোলার্ধ থেকে অন্য গোলার্ধে। জমে-থাকা বরফের মধ্যে পাওয়া গেছে কার্বন ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন, পটাশিয়াম, লোহা প্রভৃতির অস্তিত্ব। দেখা গেছে, এককালে গ্রহটির নদীতে-খালে যে পানির প্রবাহ বয়ে যেত, এখনো তার চিহ্ন আঁকা আছে পাথরের গায়ে। এসব তথ্য বলে দেয়,

একদিন মঙ্গলের মাটিতে অঙ্কুরিত হবে উদ্ভিদ

মঙ্গলগ্রহে এককালে প্রাণের অনুকূল পরিবেশ ছিল। কিন্তু আদৌ কোনোদিন সেখানে প্রাণের মুকুল ফুটেছিল কি না, বা ফুটলেও তা কতদিন টিকেছিল এবং বুদ্ধির দিকে দৌড়ে গিয়েছিলই বা কতটা তা জানা যায়নি।

মঙ্গল পৃথিবীর দুটো কাছের গ্রহের একটি, যাকে আমরা খালি চোখে তাকিয়ে দেখতে পাই। এতে রয়েছে জমাটবাঁধা সাদা বরফের মেরুটুপি – পৃথিবীর মতো, সঞ্চয়মান সাদা মেঘ, প্রচণ্ড ধুলোর ঝড়, ঋতুর বৈচিত্র্য, এমনকি চব্বিশ ঘণ্টার দিন। মানুষের পক্ষে পৃথিবীর বাইরে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে এটি হতে পারে এক চমৎকার জগৎ। বিজ্ঞানীরা এখন তোড়জোড় করছেন গ্রহটিতে সশরীরে মানুষ পাঠাবেন বলে। কিন্তু এটি একটি হিমায়িত, উষর, শুকনো মরুগ্রহ। এখানে রয়েছে বায়ুমণ্ডলের চাপের স্বল্পতা, অক্সিজেনের অভাব, তরল পানির অপ্রাপ্যতা, উঁচু মাত্রার অতিবেগুনি রশ্মির আঘাত ইত্যাদি। এমন বৈরি পরিবেশে মানুষ কি পারবে বাঁচতে?

আজকের বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, মঙ্গলকে একটি বসতিযোগ্য গ্রহ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। এর জন্যে প্রথম পদক্ষেপ হবে এর বায়ুমণ্ডলকে উষ্ণ করে তোলা। মঙ্গলের মাটিতে কলকারখানা স্থাপনের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন উষ্ণ গ্যাস ছড়িয়ে দিয়ে এটা করা যেতে পারে। অথবা তার চাঁদ ফোবোসের কালো মাটি নিয়ে গিয়ে তাতে ঢেলে দিবে। কারণ কালো জিনিস অধিক পরিমাণে তাপ শোষণ করতে পারে। বড়োসড়ো প্রতিফলক আয়না বসিয়ে সূর্যের আলোকে মঙ্গলের দুই মেরুর বরফের টুপিতে ফেলা যায়। এতে বরফ গলে হবে পানি ও জলীয়বাষ্প। আকাশে জমবে মেঘ, ঝরবে বৃষ্টি। পানিতে ভরে উঠবে মঙ্গলের ডোবা-গর্ত-নদী-খাল। অঙ্কুরিত হবে উদ্ভিদ। প্রথম দিকে চাষ হবে ছত্রাক-শ্যাওলার, তারপর আলু-গম-সয়াবিনের। জাগবে দূর্বা-মধুকূপী। ফুটবে গোলাপ-চাঁপা-মল্লিকা-মালতী, বাতাস আমোদিত হবে। গুঞ্জরন তুলবে মৌমাছি-ভোমরা। বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকে ধীরে ধীরে ছাড়া পাবে অক্সিজেন। ঘনত্ব বাড়বে বায়ুমণ্ডলের চাপও। বাধা পাবে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি। আকাশে মাথা তুলবে শাল-তমাল-পাইন। নদীতে আন্দোলিত হবে রুই-কাতলা কিংবা ইলিশের নৃত্যে। হাওয়ায় ডানা মেলবে প্রজাপতি-চড়ুই-ঈগল। অরণ্য কাঁপাবে চিত্রল হরিণ কিংবা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। এজন্যে হয়ত শত-শত, এমনকি হাজার-হাজার বছর লেগে যেতে পারে। সুদূর ভবিষ্যতের কোনো এক সোনালি সকালে মানুষের চরম অগ্রসর প্রযুক্তি হয়ত এই সবকিছুকেই করে তুলবে সম্ভব। আর তখন শেষের কবিতার নায়ক-নায়িকার মতো অন্য কোনো অমিত ও লিলির, কিংবা লাবণ্যর পক্ষে 'মঙ্গলগ্রহের লাল-অরণ্যের ছায়ায়' অথবা 'তার কোনো একটা হাজার-ক্রোশী খালের ধারে' দেখা হয়ে যাওয়াটা হয়ত অসম্ভব নয়।

মঙ্গলগ্রহের টুকিটাকি

মহাবিশ্বের ৮টি গ্রহের মধ্যে মঙ্গলগ্রহ একটি। আমাদের সৌরজগতের অন্যতম একটি অংশ এই গ্রহ।

- আমরা খালি চোখে রাতের আকাশে দেখতে পারি এমন ৫টি গ্রহ রয়েছে তাদের মধ্য মঙ্গলগ্রহ একটি, অন্য চারটি গ্রহ হলো- বুধ, বৃহস্পতি, ভেনাস এবং শনি গ্রহ।
- মঙ্গলের নিজের একটি পতাকা রয়েছে, নাসার একজন ইঞ্জিনিয়ার এটির ডিজাইন করেছেন।
- মঙ্গলের ২টি উপগ্রহ রয়েছে, নেপচুনের রয়েছে ১৪টি, ইউরেনাসের রয়েছে ২৭টি, শনি গ্রহের রয়েছে ৬২ টি এবং সবচেয়ে বড়ো বৃহস্পতি গ্রহের রয়েছে ৬৭টি উপগ্রহ, পৃথিবীর রয়েছে ১টি।
- মঙ্গলগ্রহের আয়তন পৃথিবীর তুলনায় প্রায় অর্ধেক।
- মঙ্গলে মানুষের ওজন পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ৬০% কম।
- মঙ্গলগ্রহের গড় তাপমাত্রা মাইনাস ৮১ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা মাইনাস ৬৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
- মঙ্গলগ্রহ দেখতে লাল দেখায় কারণ এটিকে ঘিরে রয়েছে আয়রন অক্সাইডের স্তর।
- এখন পর্যন্ত মঙ্গল গ্রহে ঠিক ৭টি রোবট রয়েছে; এই রোবটগুলোই মঙ্গলের জনসংখ্যা।
- মঙ্গলে সূর্যাস্ত দেখতে গাঢ় নীল রঙের।
- প্রায় ৪০০ কোটি বছর আগে মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে অনেক বেশি পরিমাণ অক্সিজেনসমৃদ্ধ ছিল।

মঙ্গলগ্রহ নিয়ে চলচ্চিত্র

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে অনেক কিছু জানলে কিন্তু এটা জানো কি এই মঙ্গলগ্রহ নিয়ে পৃথিবীর মানুষেরা বেশ কিছু চলচ্চিত্র তৈরি করেছে। এসো জেনে নিই এসব বিখ্যাত চলচ্চিত্র সম্পর্কে-

মার্শিয়ান চাইল্ড

এই চলচ্চিত্রটি ছয় বছর বয়েসি একটি ছেলে ডেনিসকে নিয়ে। ডেনিস অন্য শিশুদের থেকে আলাদা। তার কোনো বন্ধু নেই। সূর্য দেখলে ভয় পায়। সারাদিন একটি বক্সে লুকিয়ে থাকে। সে নিজেকে মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছে বলে পরিচয় দেয়। অন্যদিকে ডেভিড গর্ডন পেশায় একজন কল্পকাহিনি লেখক। তার স্ত্রী হঠাৎ মারা যান। তার দুই বছর পর ডেভিড ডেনিসকে দত্তক নেন। ডেভিড বাবার স্নেহে ডেনিসকে লালন-পালন করতে থাকেন। একসময় ডেনিস স্বাভাবিক শিশুদের মতো হতে থাকে। কিন্তু ডেনিস একদিন বাড়ি থেকে চলে যায় মঙ্গলগ্রহে যাবে বলে। তারপর কী হয়! ডেভিড কী ডেনিসকে ফিরিয়ে আনতে পারেন? জানতে হলে চমৎকার চলচ্চিত্রটি তোমাদের দেখতে হবে কিন্তু।

দ্যা মার্শিয়ান

নাসা'র একদল নভোচারী মঙ্গলগ্রহে অভিযানে যান। হঠাৎ একদিন শক্তিশালী বালুঝড়ে দলের একজন সদস্য মার্ক ওয়াটনি ছিটকে পড়েন। দলের অন্যান্য সদস্যরা ভাবেন মার্ক মারা গেছেন। ঝড় থেকে বাঁচতে তারা দ্রুত পৃথিবীতে ফিরে আসে। কিন্তু মার্ক বেঁচে যান। জ্ঞান ফিরলে মার্ক নিজেকে গ্রহে একা দেখতে পায়। সেখানে থাকে না পানি, খাবার আর বেঁচে থাকার মতো উপযোগী পরিবেশ। এরপর শুরু হয় মার্কের বেঁচে থাকার এক অবিরাম সংগ্রাম। মার্ক কীভাবে সেখানে বেঁচে থাকে? মার্ক কী আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে? এইসব প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে দেখতে হবে 'দ্যা মার্শিয়ান'।

দ্যা স্পেস বিটুইন আস

মঙ্গলগ্রহ নিয়ে মজার একটি চলচ্চিত্র এটি। গার্ডনার ইলিয়ট মঙ্গলগ্রহে জন্মগ্রহণকারী প্রথম মানব সন্তান। জন্মের পরপরই তার মা মারা যান। সে মঙ্গলগ্রহেই বড়ো হতে থাকে। সে তার বাবা এবং নিজের সম্পর্কে জানতে চায়। একপর্যায়ে পৃথিবীর যুক্তরাষ্ট্রবাসী একটি মেয়ে তলসার সাথে অনলাইন বন্ধুত্ব হয়। গার্ডনার সুযোগ পেয়ে পৃথিবী ভ্রমণে আসে। পৃথিবীর সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ হয়। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন গার্ডনারের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পৃথিবীর পরিবেশে উপযুক্ত নয়। তাই তাকে আবার মঙ্গলগ্রহে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু গার্ডনার পালিয়ে যায় এবং বন্ধু তলসার সাথে দেখা করে। তারপর শুরু হয় তলসাকে নিয়ে তার বাবাকে খোঁজা এবং পৃথিবীতে নিজেকে উপযোগী করে তোলার এক রোমাঞ্চকর অভিযান। এরপর গার্ডনার কী তার বাবাকে খুঁজে পায়? সে কী পৃথিবীতেই থেকে যায়, না মঙ্গলগ্রহে ফিরে যায়? জানতে হলে দেখতে হবে 'দ্যা স্পেস বিটুইন আস'।

ওয়ার অব দ্যা ওয়ার্ল্ডস

এই চলচ্চিত্রটি একজন বাবা ও তার দুই সন্তানকে নিয়ে। বাবা রেই একজন ডকইয়ার্ড কর্মচারি। ছুটির দিনগুলোতে রেই তার ছেলেমেয়েকে দেখাশোনা করে। এরই মাঝে হঠাৎ একদিন ভিনগ্রহের এলিয়েনদের আক্রমণ ঘটে পৃথিবীতে। তারপর রেই তার দুই সন্তানকে এলিয়েনদের থেকে বাচাঁনোর সংগ্রাম চালিয়ে যায়। রেই কী পারে তার দুই সন্তানকে এলিয়েনদের থেকে রক্ষা করতে? কীভাবে রক্ষা করে? এগুলো জানতে 'ওয়ার অব দ্যা ওয়ার্ল্ডস' চলচ্চিত্রটি দেখতে হবে।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

এইচ.জি. ওয়েলস

হার্বার্ট জর্জ ওয়েলস একজন জনপ্রিয় ইংলিশ লেখক। তবে তিনি সুপরিচিত একজন কল্পকাহিনি উপন্যাস লেখক হিসেবে। এইচ.জি. ওয়েলসকে বলা হয় 'ফ্যাদার অব সায়েন্স ফিকশন'। তার বিখ্যাত কিছু কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: দ্যা টাইম মেশিন, দ্যা ওয়ার অব দ্যা ওয়ার্ল্ডস, দ্যা ফার্স্ট মেন ইন দ্যা মুন, দ্যা আইল্যান্ড অব ডক্টর মোরেও, দ্যা ইনভিজিবল ম্যান ইত্যাদি।

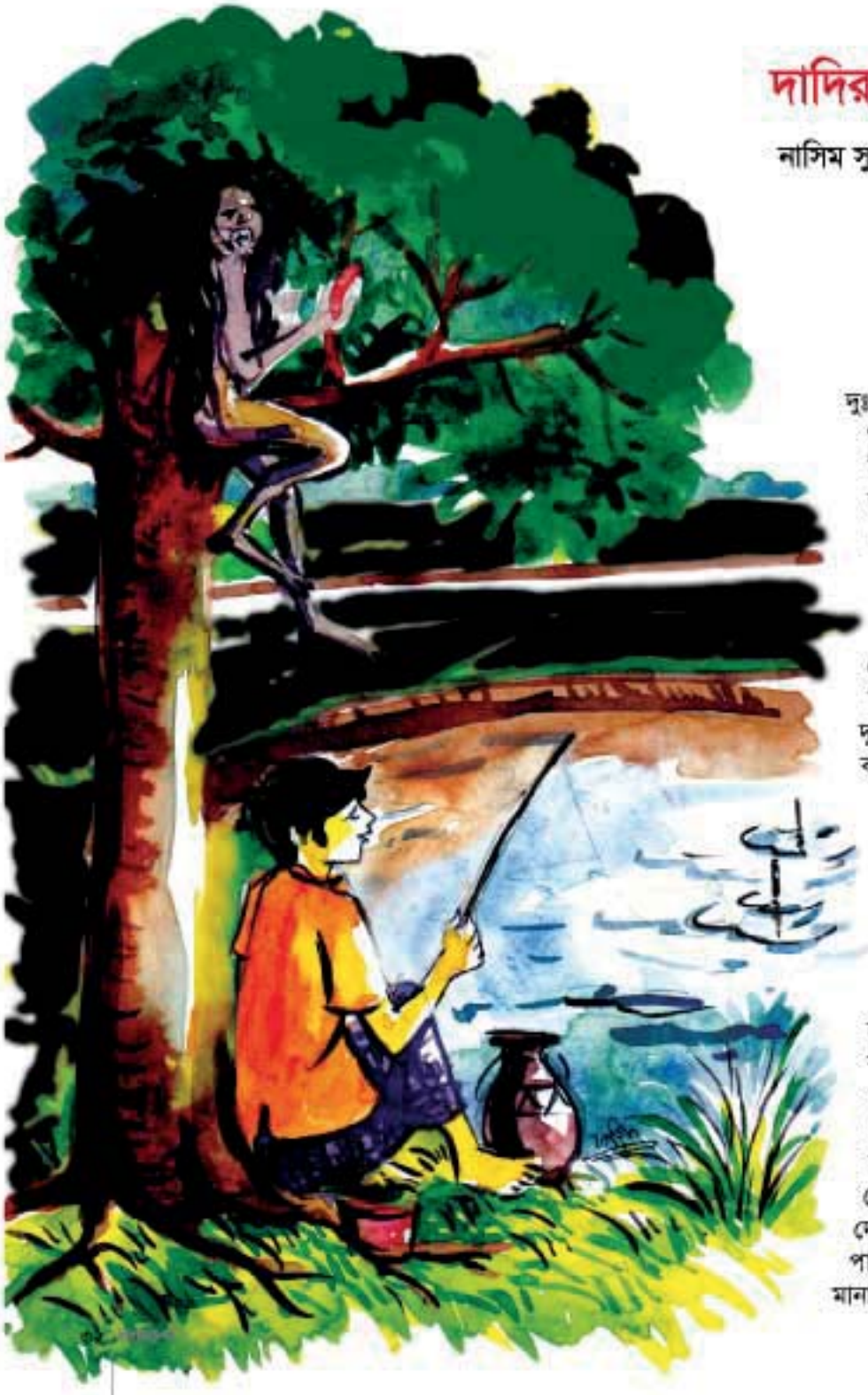

দাদির গল্প

নাসিম সুলতানা

দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প শুনতে ইফতেখারের খুব ভালো লাগে। তাই লেখাপড়ার ফাঁকে সময় পেলে এসব অভিযানের গল্পের বই পড়ে। এইতো এবার বইমেলায় ৩টা বিভিন্ন ধরনের দুঃসাহসিক অভিযানের বই কিনেছে। ইফতেখারের পরীক্ষা সবেমাত্র শেষ হয়েছে। উদয়ন স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। বাবা'র দুটি সন্তানের মধ্যে সে ছোটো। পরীক্ষা শেষ হয়েছে, তাই গ্রামের বাড়িতে দাদা- দাদির কাছে যাওয়ার বায়না ধরেছে। মা তো রাজি নয়। মায়ের কথা মেনে চললে তবে দেশের বাড়ি যেতে পারব। পুকুরে নামতে মানা, একা একা কোথাও

যাওয়া যাবে না ইত্যাদি। সব কথা মেনে নেয়ায় অবশেষে ছোটো চাচা এসে তাকে নিয়ে গেল। তাদের বাড়ি টাঙ্গাইল জেলায় কালিহাতি থানার বাংড়া গ্রামে।

ইফতেখার মাকে বলে গেল পুকুরে নামবে না। কিন্তু পুকুরে না নামলে সাঁতার কাটা শিখবে কেমন করে। যাক, ছোটো চাচা বলল-আমি তোকে সাঁতার কাটা শেখাব।

রাতের বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর আমি সোজা দাদির কাছে শুয়ে পড়লাম। কারণ দাদির কাছে অনেক মজার মজার গল্প শোনা যায়। ছোটো চাচার ছেলে রিফাতও তার সাথে বন্ধুর মতো। যদিও সে এক ক্লাশ নিচে পড়ে।

দাদির দুই পাশে শুয়ে ওরা দু'জন বায়না ধরল একটা ভূতের গল্প বলো।

দাদি আর কী করবে... গল্প বলা শুরু করল। ও পাড়ার মোস্তফা মাস্টার তোমাদের চাচা হয়। তার মাছ ধরার খুব নেশা ছিল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে মাছ ধরতে যাবে। একদিন সে পুরাদহে মাছ ধরতে যায়, দহ মানে অনেক গভীর পানি বুঝেছ। এখানে অনেক বড়ো বড়ো মাছ পাওয়া যায়। তার সাথে কেউ নাই। বাড়ির সবাই তাকে না করল। কারণ সন্ধ্যার সময় রওনা দিলে যাওয়া-আসা মিলে ঘন্টা দুই লেগে যাবে। তারপর মাছ ধরতে অনেক সময় লাগে। বড়শিতে মাছ ধরা এটা ভাগ্যের ব্যাপার। কখনও বড়ো মাছ পাওয়া যায়, কখনও পাওয়া যায় না। কিন্তু সে কারও কথা না শুনে একাই রওনা দিল।

দাদি একটু চুপ করল। উনি তাকিয়ে দেখলেন-ওরা দু'নাতি ঘুমাচ্ছে কি-না। না...দু'জনে চাতক পাখির মতো তার দিকে তাকিয়ে আছে। ইফতেখার তো অধৈর্য্য হয়ে বলল-দাদি বলো বলো, গল্পটা শেষ করো। দাদি আবার শুরু করল-মোস্তফা মাস্টার বিলের কাছে পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত হয়ে গেল। বিলে পৌঁছে সে বড়শি বের করে আধার দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করতে লাগল। পাঁচ-ছয়বার বড়শিতে কোনো মাছই উঠল না। পরের বার বড়শি ফেলতেই দেখে বড়শিটা কেমন যেন ভার ভার লাগছে। সে আলো-ছায়ায় বুঝতে পারল তার বড়শিতে বড়ো মাছ ধরা পড়েছে। বড়শি টান দিয়ে দেখে একটা বিরাট বোয়াল মাছ। মোস্তফা খুশিতে মাছটা ভালো করে রেখে দ্বিতীয়বারও বড়শি ফেলল। দেখে এবারও কেমন ভার ভার লাগছে। তারপর যথারীতি দেখল আগেরটার মতো আর একটি বোয়াল মাছ। ব্যাস, আর কি! সে খুশিতে নাচতে নাচতে সব সরঞ্জাম গুছিয়ে মাছ দুটো কাঁধে ঝুলিয়ে রওনা দিল।

মোস্তফা মাস্টার জোরে জোরে পা ফেলে হাঁটছে ঠিকই, কিন্তু পথ তো সামান্য না। অনেক দূর,... না হলেও দেড় মাইল। মাঠের পর মাঠ। এর মধ্যে বট গাছ, পাকুড় গাছ, তেঁতুল গাছ সব পার হয়ে... তারপর মোস্তফাদের গ্রাম। অর্থাৎ আমাদের গ্রাম।

মোস্তফা যখন মাছ ধরতে গিয়েছিল তখন ওর মা, দাদি ও বউ না করেছিল। বলেছিল-তোর যখন এত মাছ ধরার শখ তো আমাদের পুকুরে বড়শি দিয়ে মাছ ধর। এত রাত করে ঘুম কামাই করে এ নেশা ভালো না। মায়ের এ বারণ সে শুনে নাই।

আজ মোস্তফাও বুঝতে পারেনি-সে যে এই ভয়ানক বিপদে পড়বে।

মোস্তফা হাঁটছে তো হাঁটছেই। আকাশে মনে হয় মেঘ করেছে। চাঁদের আলো কেমন যেন একবার ঝিলিক দিয়ে দেখা দেয়, আবার আলোটা কয়েক মিনিটের মধ্যে অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। আকাশের তারাগুলো মনে হয় জ্বলছে না। মোস্তফার মনে কেমন যেন এক অজানা ভয় উঁকি দিচ্ছে। তার মনে হলো কে যেন তার কানে গরম ফুঁ দিচ্ছে। আবার একটু পর মনে হলো কানে কানে বলছে-মোস্তফা মাছ দু'টো দিয়ে যা। যখন সে তেঁতুল গাছটা পার হচ্ছে তখন হ্যারিকেনের বাতি নিভে গেল। মোস্তফার কাঁধ থেকে কে যেন মাছসহ বড়শি সব কেড়ে নিল। তার আর বুঝতে বাকি থাকল না যে এসব ভূতেরই কাণ্ড! সে অবস্থা বেগতিক দেখে একবারে দিল ভৌ দৌড়। কারণ তেঁতুল গাছ থেকে সোজা কিছুটা দূর গেলেই তাদের বাড়ি। বাড়ি তো পৌঁছল ঠিকই, কিন্তু উঠোনে উঠেই সে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। তার দাদি মসজিদের ইমাম সাহেবকে ডেকে অনেক দোয়া-দরুদ পড়ে ফুঁ দেয়ালেন। মোস্তফার জ্ঞান ফিরল অনেক পড়ে। সে এ যাত্রা জানে বেঁচে গেল এবং প্রতিজ্ঞা করল-আর এত রাতে একা কখনো মাছ ধরতে যাবে না। এসব ভূতেরা অনেক সময় মানুষকে মেরেও ফেলে।

দাদির এ গল্প শুনে দুই নাতি তাকে জড়িয়ে ধরল। তখন দাদি বললেন, এতো কেবলই গল্প! ভূত তো আর সত্যি সত্যি থাকে না।

আজব আড্ডাখানা

শাফিকুর রাহী

নান্নু মিয়া স্বপ্নে নাকি জ্বিন পরিদের আড্ডায়,
তেলেসমাতি কাণ্ড ঘটায় বারিধারা বাড্ডায়।
গুলিস্তানের গুলিমিয়াও গুলবাগের এক বাসায়,
কল্লাকাটা ভূতের কিচ্ছায় দারুণ রকম হাসায়।
হাসির চোটে দ্বিগুণ বাড়ে চাম্পু শেখের কাশি,
অমনি হঠাৎ উঠল বেজে র‍্যাব-পুলিশের বাঁশি।
চতুর্দিকে রটে গেল কানকাটা ভূত কান্নু,
গ্রেফতারের ভয়ে ছিটায় চক্ষে মুখে বান্নু।

খবর পেয়ে লাখো মানুষ জটলা পাকায় রাস্তায়,
ভূতের পোলা খাবে নাকি একডজন ডিম নাস্তায়।
বাঁশের লাঠি লোহার বন্দুক ক্যাঁচকা মাইর দিতে,
দেয়াল ভেঙে পালায় যে ভূত ব্যাপক বাঁদরামিতে।
সে খবরটা পৌঁছে গেল টোকিও বেতারে,
বাজল খবর বিশ্বজুড়ে চিনহুয়া সেতারে।
আকাশ বাণী করল প্রচার অসম্ভব কাহিনি,
ভূতের সিন্ডিকেটে ছিল ভয়ঙ্কর বাহিনী।

সেই ভূতেরই বসল আড্ডা জমকালো রেস্তোরাঁয়,
টিকটিকিও জানল শেষে, পৌঁছে নাখালপাড়ায়।
এছাকেছা ভূত হায় ভাইয়া এ্যায়া কেয়া হায় সুরত,
আচ্ছাবাত টের পেয়ে ভূত লাগল অমনি ফুরত।
মামার বাড়ির আবদার হায়; ভূত ধরা নয় সোজা;
ভূতের লাথি ঠুয়া খেয়ে খসল পায়ের মোজা!
আসমান জমিন বেবাকতনে ভূতের আড্ডাখানা,
ভূতের গল্পে চুনমুনু হাসিতে আটখানা।

লান্নু ভূত হায় ভীষণ চান্নু হাঁটে গাছের পাতায়,
রাতদুপুরে পড়ল পাতা রানু গিন্নির মাথায়!
হঠাৎ একি বাড়ি জুড়ে ভীষণ চিল্লাচিল্লি,
ভূতের আছর ভর করেছে খরব পাঠায় দিল্লি!
আজগুবি সব টীনা ভূতের বীণাটা বাজিয়ে,
বাংলা ভূতের বিয়ে দেবে আসরটা সাজিয়ে।
অমন খবর পেশ করল পাকিস্তানি পাণ্ডা,
মামদো ভূতের ভেলকি দাপট ডাণ্ডা মেরে ঠান্ডা!

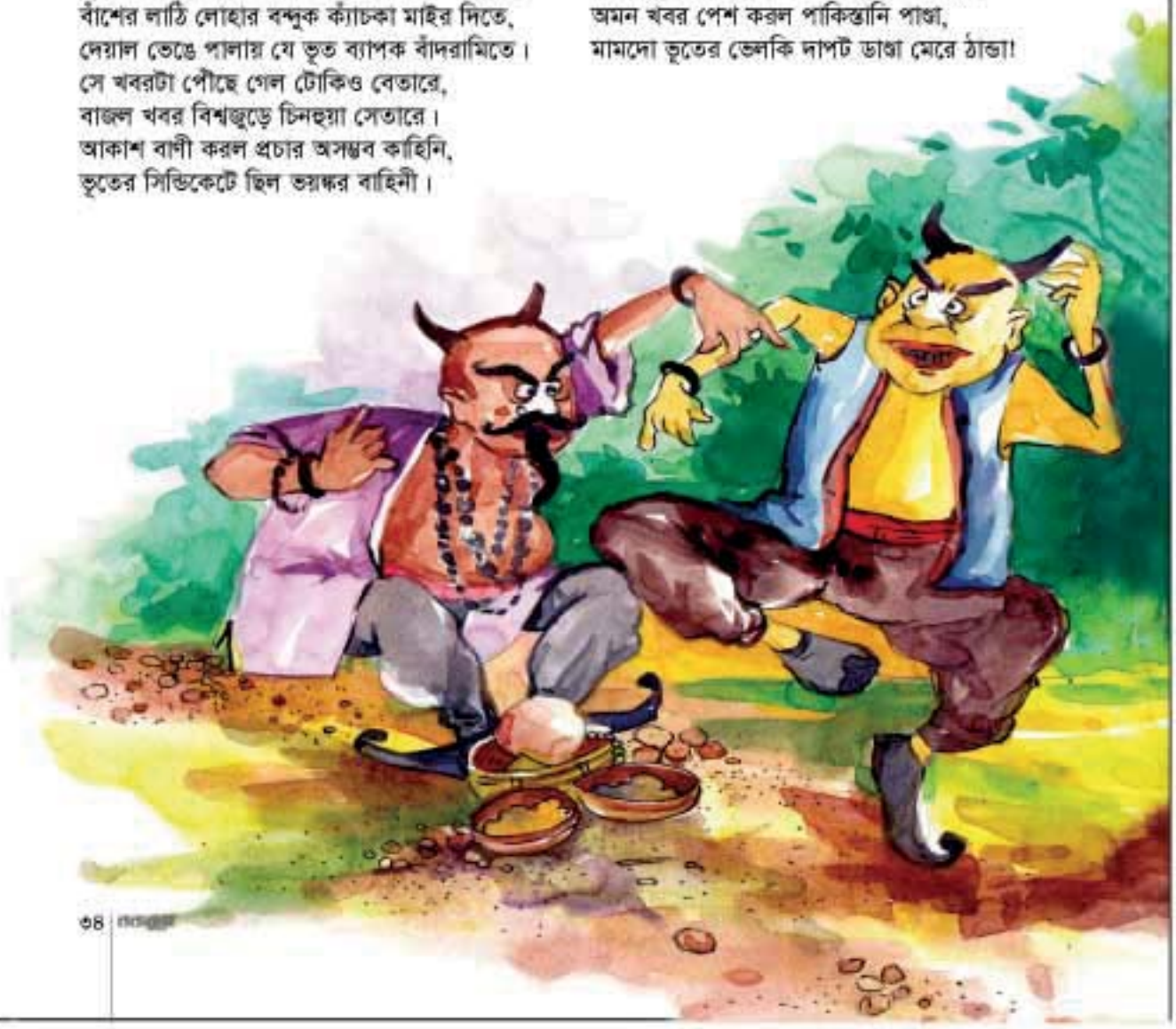

জে. কে. রাওলিং

হ্যারি পটার স্রষ্টা

শাহাদাৎ শাহেদ

ইংল্যান্ডের দক্ষিণে ছোটো একটি শহরের নাম ইয়েট। আমরা যে সময়ের কথা বলব সে সময়ে ইয়েটের আকাশ পথে কোনো পক্ষিরাজ পার হচ্ছিল কি-না আমাদের জানা নেই। তবে এটুকু জানি, কোনো এক ঘরে একটি শিশু চিৎকার করে জানান দিয়ে উঠল পৃথিবীতে আগমনের বার্তা। পক্ষিরাজের পিঠে চড়ে শিশুটি কোনো স্বপ্নের জগৎ পেয়েছিল কি-না তাও আমাদের জানা নেই। তবে কঠোর পরিশ্রম, মেধা ও অধ্যবসায় দিয়ে এই শিশুটি বাস্তব জীবনকে করেছে স্বপ্নময়– তা পৃথিবীবাসী জেনে গেছেন। আজ আমরা সেই গল্পটি শুনব।

ক্যালেন্ডার অনুযায়ী তখন ৩১ জুলাই ১৯৬৫ সাল। মাস ঘুরে বছর, শিশুটি আরো কিছুটা বড়ো হয়। লাজুক স্বভাবের এই শিশুটি হৈ হুল্লোড় না করে চুপচাপ বসে বসে বই পড়তে ভালোবাসে। আর ভালোবাসে ছোটো বোনটিকে বই থেকে পড়া গল্প শোনাতে। ছোটো বোনও গল্প না শুনে ঘুমাবেই না। গল্পের ঝুলি আর কত বড়ো হতে পারে?

বড়ো বোনটি তখন মনের মাধুরি মিশিয়ে মুখে মুখে গল্প বানাতে শুরু করল। কিছু গল্প অবশ্য লিখেও রাখল। এইভাবে শুরু হয়ে গেল বড়ো বোনটির গল্প লেখা। সেই বড়ো বোন আজ জগদ্‌বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জে. কে. রাওলিং। হ্যারি পটার নামের অসাধারণ এক চরিত্র আর কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

অনেকটা গ্রাম্য জীবনের আবহেই বেড়ে উঠেছেন রাওলিং। তার বাবা পিটার ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার এবং মা এ্যানি গবেষণাগারের টেকনিশিয়ান। রাওলিং-এর বাবা-মা দু'জনই ছিলেন পেশাজীবী। রাওলিং ও তার বোনকে একাকী সময় কাটাতে হতো। তাই তার বাবা-মা তাদের দুই বোনকে মজার মজার সব গল্পের বই কিনে দিতেন। বই পড়তে পড়তে নিজেও শিখে গেলেন গল্প বলার কায়দা। তিনি যখন গল্প লিখতে শুরু করেন তখন তার বয়স ৬ বছর। মনের মধ্যে বাসা বাঁধে লেখক হওয়ার স্বপ্ন।

কী আশ্চর্য! তার সেই স্বপ্ন আজ বাস্তব হলো। কারণ তিনি যা স্বপ্ন দেখেছেন তার জন্য পরিশ্রম করেছেন– পড়েছেন, লিখেছেন, স্বপ্ন দেখে বসে থাকেননি।

২৪ বছর বয়সে তিনি উচ্চশিক্ষা শেষ করেন। অন্য অনেকের বাবা-মায়ের মতো রাওলিংয়ের বাবা-মা'ও চাইতেন তাদের সন্তানটি কোনো কারিগরি কোর্স করে ভালো কোনো চাকরি করুক। রাওলিং-এর লেখালেখির স্বপ্নকে তার বাবা-মা সমর্থন করতে পারেননি। কারণ এতে অর্থকষ্ট লাঘবের সম্ভাবনা নেই। তারপর যখন উচ্চশিক্ষায় রাওলিং ভাষাশিক্ষা বেছে নিলেন তখনো তারা খুশি হননি। হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে সফল লেখক জে. কে. রাওলিং বলেছিলেন– 'তোমাদের বয়সে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক দূরে একটা কফি শপে বসতাম আমার গল্প লেখার জন্য। ক্লাসেও মনোযোগ দিতাম লেকচারের প্রতি। পরীক্ষায় পাস করার পর প্রতিবছরই আমি আমার সাফল্যের কথা হিসাব করতাম।'

স্নাতক সম্পন্ন করার পর তিনি চলে যান লন্ডনে। সেখানে গিয়ে সচিব হিসেবে কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারেন সচিব হওয়া তার কাজ নয়। মিটিংয়ের সময় যখন চটপট নোট নেওয়ার কথা, তখন যে তার মাথায় নতুন গল্পের আইডিয়া খেলে!

সচিব হওয়ার আশা ছেড়ে দেন তিনি। বেশ কিছুটা সময় মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালে কাজ করেন। এই সময়ের অভিজ্ঞতা তার লেখক জীবনে খুব কাজে লেগেছে। তার মুখে শুনি সে কথা– 'হ্যারি পটার আমার জীবনের এরকমই একটি কল্পনা যেটি আমার প্রথম চাকরি জীবনের একটি কল্পনা, সেই সময় কাজের ফাঁকে লাঞ্চব্রেকে আমি গল্প লিখতাম। আমি তখন চাকরি করতাম লন্ডনের অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সদর দপ্তরে আফ্রিকান গবেষণা বিভাগে। অফিসে প্রতিদিন অসংখ্য চিঠি আসত। আমি সেসব মানুষের অত্যাচারের ছবি দেখেছি। প্রায় প্রতিদিনই আমি মানুষের ওপর মানুষের নির্যাতনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। ---তখন আমি যা দেখতাম তা নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করি এবং লিখতে থাকি।'

এই সময় এক পর্তুগীজ সাংবাদিকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ে করেন, একটি মেয়েও হয় তাদের। কিন্তু মেয়ের জন্মের চার মাসের মাথাতেই রাওলিং ও তার স্বামীর বিচ্ছেদ হয়। শুরু হয় রাওলিংয়ের জীবনের সবচেয়ে কষ্টের অধ্যায়। সংসার ভেঙে গেছে, কোলে ছোট্ট মেয়ে, একটি চাকরি পর্যন্ত নেই। তীব্র অনিশ্চয়তায় কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

রাওলিং তার মেয়েকে নিয়ে লন্ডনে ফিরে আসেন ও এডিনবার্গে বসবাস শুরু করেন। সিদ্ধান্ত নেন শিক্ষকতা করবেন। সময় পেলেই স্কুলের অদূরে এক ক্যাফেতে বসে তিনি লেখালেখি করতেন। সে সময় হয়ত ছোট্ট মেয়ে জেসিকা ঘুমিয়ে থাকত তার পাশে। চরম অর্থকষ্ট, ভেঙে পড়ার অনেক কারণ থাকার পরও সামলে নেন নিজেকে।

একদিন তিনি ম্যানচেস্টার থেকে লন্ডনে যাচ্ছিলেন পাতাল ট্রেনে চড়ে। ট্রেনটিতে যাত্রীদের প্রচণ্ড ভিড়। এই অবস্থাতেই তিনি চিন্তা করছিলেন নতুন কোনো একটি লেখা নিয়ে। হঠাৎ-ই তার মনের জানালায় কড়া নাড়ে এক এতিম ছেলে। যেই ছেলেটি পালিত হচ্ছে তার এক ফুফু ও ফুপার কাছে। যারা দুজনই খুব নীচুমনের অধিকারী। ছেলেটি শত অন্যায়-অত্যাচার সহ্য করলেও সে জানে না যে, তার মধ্যে রয়েছে এক মায়াবী জাদুকরী ক্ষমতা। একইসঙ্গে তিনি তার মনের ক্যানভাসে এঁকে ফেলেন সেই এতিম ছেলেটির মুখাবয়ব। মোটা ফ্রেমের চশমা পরিহিত কালো চুলের হ্যারিকে নিয়ে ওই সময় থেকেই লেখা শুরু করেন জে. কে. রাওলিং।

তার কাছ থেকে শুনি এরপরের কথা– 'আমার কাছে তখন কোনো ভালো কলম ছিল না, অন্যদের কাছ থেকে কলম চাইতেও আমার লজ্জা লাগছিল। আমি এখন মনে করি তা একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। কারণ আমি তখন কেবল বসে বসে চিন্তা করেছি। চার ঘন্টার জন্য এবং সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আমার মগজে জমা হচ্ছিল। এই চর্মসার, কালো চুলের, চশমা পরা ছেলে জানত না যে সে একজন জাদুকর, যা আমার কাছে ক্রমেই আরো বাস্তব মনে হতে থাকে। আমি মনে করি যে আমাকে যদি একটু ধীরে কল্পনা করতে হতো, যাতে আমি তার কিছু অংশ কাগজে লিখতে পারি। তাহলে আমি হয়ত সেই কল্পনার কিছু অংশ বাদ দিয়ে দিতাম।'

তার জনপ্রিয় সিরিজ হ্যারি পটার প্রকাশের আগেও দুই একটি উপন্যাস প্রকাশ হয়েছিল। হ্যারি পটার সিরিজের প্রথম গল্পটি লেখা শেষ হওয়ার পরের কাজ প্রকাশ করা। ১৯৯৬ সালে 'হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ফিলোসফার্স স্টোন' পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশকদের হাতে দেওয়া হয়। প্রকাশকদের কাছে গিয়ে তার খুব ভালো অভিজ্ঞতা হয়নি। কেউ তার বইটি প্রকাশ করতে রাজি হচ্ছেন না। তাদের ধারণা ছিল, এই বই প্রকাশ করলে ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। একে একে তিনি ৮টি প্রকাশনীর কাছে যান। তবুও হাল ছাড়েননি তিনি। চেষ্টা চালিয়ে যান। টানা এক বছর ধরে চেষ্টার পর একজন প্রকাশক পাওয়া যায়।

প্রকাশক নিগেল নিউটন বইটি নিয়ে বেশি উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি বাসায় নিয়ে যান। তবে নিজে এটি পড়েননি। বরং তার আট বছর বয়সী মেয়ে এলিসকে পড়তে দেন। পাণ্ডুলিপিটি পড়ে এলিস নিউটন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পিতাকে বই প্রকাশ করতে তাগাদা দেয়। অন্য আট প্রকাশক বইটি প্রকাশে অসম্মতি জানানোর পর বুমসবারি'র প্রকাশক নিগেল নিউটন জে. কে. রাওলিংকে অগ্রিম ২,৫০০ ডলারের প্রস্তাব দেয়।

১৯৯৭ সালের ২৬ জুন হ্যারি পটার সিরিজের প্রথম বই 'হ্যারিপটার এ্যান্ড দ্য ফিলোসফার্স স্টোন' প্রকাশ করা হয়। প্রথম প্রকাশে ছাপা হয়েছিল এক হাজার কপি, যার মধ্যে ৫০০ কপিই বিক্রি করা হয়েছিল বিভিন্ন স্কুলের লাইব্রেরির কাছে। হ্যারি পটারের প্রথম সংস্করণের সেই বইগুলো আজ পৃথিবীজুড়ে সংগ্রাহকদের কাছে এক অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য সম্পদ বলে

বিবেচিত হয়। আর প্রতিটি বইয়ের বর্তমান দাম ২৫ হাজার পাউন্ড বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৩৩ লাখ টাকা।

মজার ব্যাপার হলো– রাওলিং হ্যারি পটার লেখার সময় কোনো নির্দিষ্ট বয়সের পাঠকের কথা তার মাথায় রাখেননি। প্রকাশকেরা প্রথমে বইটিকে ১১ বছর বয়সি পাঠকের উপযোগী হিসেবে ধরে নেন।

হ্যারি পটার সিরিজের গল্প লেখার পর বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন রাওলিং। মাঝেমধ্যে ছদ্মনামেও লেখেন তিনি। রবার্ট গালব্রেইথ ছদ্মনামে 'দ্য কুকু'জ কলিং নামের একটি বই লেখেন ২০১৩ সালে। তার এই বইটি যখন প্রকাশিত হয় তখন খুব বেশি কপি বিক্রি হয়নি। কিছুদিনের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে যায় যে, এই বইটি রাওলিং-এর লেখা। ব্যাস রাতারাতি কয়েকশত থেকে ১.৫ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয় সেই একই বই।

লেখকের আসল নাম-পরিচয় বেরিয়ে আসে।

হ্যারি পটার সিরিজের সকল বই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া বইয়ের তালিকায় স্থান পেয়েছে। প্রকাশনা জগতের ইতিহাসে সব রেকর্ড ভেঙে 'হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য গবলেট অব ফায়ার' বইটি প্রকাশ হওয়ার প্রথম দিনেই যুক্তরাজ্যে বিক্রি হয় প্রায় তিন লাখ কপি আর দুদিনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হয় ৩০ লাখ কপিরও বেশি! সিরিজটি রঙিন পর্দায়ও বাজিমাত করে। অসংখ্য পুরস্কার, সম্মাননা ও স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি। তিনিই হলেন একমাত্র বিলিয়নিয়ার লেখক যিনি বই লিখেই বিলিয়নিয়ার হয়েছেন।

সাফল্যের শিখরে উঠলেও নিজের সবচেয়ে কষ্টের দিনগুলোর স্মৃতি ভুলে যাননি রাওলিং। ২০০০ সালে একটি দাতব্য ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন, যা দুস্থ নারী ও শিশুদের জন্য প্রতিবছর প্রায় ৫০ লাখ পাউন্ডের

দ্য কুকু'জ কলিং গোয়েন্দা কাহিনির উপন্যাস। প্রকাশক-এর লেখক 'রবার্ট গলব্রেইথ'- কে ব্রিটিশ রাজকীয় সামরিক পুলিশ বাহিনীর একজন সাবেক সদস্য এবং ২০০৩ সাল থেকে একটি বেসামরিক নিরাপত্তা সংস্থায় কর্মরত বলেও উল্লেখ করেন। সামরিক বাহিনীতে কাজ করা একজন লেখক তার প্রথম গোয়েন্দা কাহিনিতেই কীভাবে এত ভালো গল্প সাজাতে পারলেন, তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেওয়ায় সানডে টাইমস পত্রিকা অনুসন্ধানে নামে। তখনই

মতো সহায়তা প্রদান করে থাকে। রাওলিং বলেন– 'আমি শিখেছি বিশাল এক অনুভূতির মধ্যে কল্পনার বা কল্পনাশক্তির কী মূল্য। কল্পনাশক্তিই আবিষ্কার আর অনাবিষ্কারের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয়। কল্পনাশক্তি যদি প্রবল হয়, তবে সফল হওয়াটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। এই কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে, করতে হবে এর যথাযথ ব্যবহার। সবাই পারে না। যারা পারে তারাই সফল। সুতরাং তুমি নিজেই ঠিক করো, তুমি কোন দলে থাকবে।'

ফুলি

শরীফ খান

ধুলো ওড়া পথটি গেছে রূপসা নদীর দিকে। নদীর বাঁকে হিজল গাছের সারি। ওই টুকু পথ দিতে হবে পাড়ি, তারপরেই না হারুন হাজির তিনতলা এক বাড়ি। বাড়ির সামনে মস্ত বড়ো উঠোন। উঠোনের কোণে সারি সারি ধানের গোলা অনেক গুলো। ওই বাড়িতেই যাচ্ছে এখন ফুলি। মোষের গাড়ির চারপাশটা জুড়ে উড়ছে শুধু ধূলি। ফুলি মোষের গাড়ি হাঁকিয়ে দিয়েছে জোরসে। তাগড়া মোষ দুটো বলা যায় দৌড়েই চলেছে গাড়ি ভর্তি ৪০ মণ ধান নিয়ে। বস্তা মোট ১৬টি। বাড়ি থেকে রওনা দেওয়ার সময় বাজান পইপই করে বলে দিয়েছেন, 'ফুলি, মা আমার, সাবধানে গাড়ি চালাস কিন্তু! বোশেখ মাস। মাঠঘাট পোড়া রোদ– যাবার পথে পুকুর-টুকুর পড়বেনে, মোষ দুইটেরে কিন্তু সামলে রাহিস মা! নাহোলি কিন্তু সব্বনাশ হইয়ে যাবে।' মোষের লেজে মোচড় দিয়ে আর গলায় 'টাক্ টাক্' আওয়াজ তুলে গাড়ি চালিয়ে দিয়ে ফুলি বলেছিল, 'তুমি কোনো চিন্তা কইরো নাতো বাজান! তোমার কথা বুঝিছি আমি।'

গাড়ি যতক্ষণ নজরে ছিল, ফুলির মা-বাবা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েই ছিলেন। বাবার চোখে মনোকষ্টের জল। ১১ বছর বয়সি মেয়েটা তার সংসারের জন্য কত কাজই না করে! বাড়ন্ত শরীর ওর। দেখায় ১৫-১৬ বছর বয়সি মেয়েদের মতো। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া-কোঁকড়া চুল। খাঁড়া নাক। ভাসা ভাসা দুটি সাহসী-বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। সেই মেয়েটিকেই আজ পাঠাতে হলো বর্গাভাগের ধান দিয়ে আসার জন্য চার মাইল দূরের হারুন হাজির বাড়িতে। ছেলে একজন আছে ফুলির চেয়ে তিন বছরের বড়ো। লেখাপড়া শেখানোর আশায় তাকে সেই ছেলেবেলা থেকেই দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের জিম্মায় দিয়ে দিয়েছে। সেই আত্মীয় থাকে ঢাকা শহরে। গার্মেন্টস-এ চাকরি করে। তার বাসাতেই থাকে ছেলেটি। পড়ে এবার ক্লাশ সেভেনে। ছুটিতে বছরে দু-একবার বাড়িতে আসে। সেই আত্মীয় ফুলিকে নিয়ে গার্মেন্টস-এ ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ফুলি গেলে এই বাড়িটাতে আর থাকবে কী! কে সাহায্য করবে গরিব মা-বাবাকে! বাড়িটা মরে যাবে না! তাই ওকে যেতে দেওয়া হয়নি।

ফুলি কোনোদিন স্কুলে যায়নি। শৈশবটা কেটেছে তার ছাগল-গরু চড়িয়ে। বিল-ঝিল-খালে ও নদীতে মাছ ধরে ধরে। মায়ের সঙ্গে গ্রামের গেরস্থ বাড়িগুলোতে কাজকর্ম করে। ফুলি ধানমাড়াই থেকে শুরু করে ধান শুকানো এবং সেদ্ধ পর্যন্ত করতে পারে। তাল-খেজুরের রস জ্বাল দিয়ে গুড়-পাটালি বানাতে পারে। গরুর জন্য খড় বটিতে ফেলে কুটো করে কাটতে পারে। মোষের পিঠে চড়ে নদী-খাল পাড়ি দিতে ওস্তাদ। গাছে চড়তে পারে বানরের মতো। দৌড়াতে পারে দ্রুতবেগে। ভূতপ্রেতে ওর কোনো

ভয় নেই। ওর হাসিটা দারুণ সুন্দর। কিন্তু ওর হাসির আড়ালের দুঃখটা যে কেউই ধরে ফেলতে পারে। তালের ডোঙ্গা বেয়ে ও বর্ষাকালে মাঠ-বিলে গিয়ে শাপলা-কলমি ও পদ্ম ফুল তুলে আনে। চারো-বোচনো ও পাতানো জাল পেতে মাছ ধরে। অভাবি সংসারের জন্য ও খেটে যায় দিনভর। অবসরে গাছে চড়ে গলা খুলে গান গায়। পাড়ার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলায় মাতে। নানা-নানি ও দাদা-দাদি ওকে বুনো ও পেতনি বলে ডাকে।

সেই মেয়েটার উপরেই আজ মহাজনের বাড়িতে বর্গাভাগের ৪০ মণ ধান পৌঁছে দেবার দায়িত্ব বর্তেছে। মাত্র তিনদিন আগে গ্রামের শোয়েব খোন্দকারের বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কেটে দিতে গিয়ে কাটা বাঁশের গুঁড়িটা পড়েছিল ফুলির বাবার ডান পায়ের উপরে। পায়ের পাতা যেন ফুটো হয়ে গেছে। হাড় মচকেছে। পায়ের পাতায় ব্যান্ডেজ পড়েছে। ফুলে গোদ রোগীর পায়ের মতো হয়ে গেছে। লাঠি ভর দিয়ে হাঁটতেও কষ্ট হচ্ছে খুব। তবে, মেয়েটির উপর ষোলো আনা ভরসা আছে মা-বাবার। বুক ভরা সাহস ওর, চোখ ভরা বুদ্ধি। গ্রামের সবাই ওকে বুদ্ধিমতি হিসেবে জানে। মুরুব্বিরা বলেন– দস্যি মেয়ে। বলবে না! ও যে সাঁতরে ছেলেদেরও হারিয়ে দেয়। প্রতি বছর ফাল্গুনে 'সাধুর গাছতলায়' বসে বিশাল এক জমজমাট মেলা। ঘোড়দৌড় হয় ওখানে। ফুলিই গত বছর পর্যন্ত গ্রামের হাবিব মোল্লার লাল টাট্টু ঘোড়াটার সহিশ ছিল। ও যে কবার সহিশ ছিল সে ক'বছরই ২০/৩০ টা ঘোড়াকে হারিয়ে দিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল হাবিব মোল্লার ঘোড়াটাই। ফুলি যেন আঙনের ফুলকি। দুলকি চালে হাঁটে। ঘোড়া দাবড়াবার মন্ত্রও বুঝি জানে ও!

সেই ফুলি এখন মোষের গাড়ি নিয়ে চলেছে চার মাইল দূরের হারুণ হাজির বাড়িতে। ওখানে গেলেই হাজি সাহেবের ক্ষেত-শ্রমিকরা নামিয়ে নেবে বস্তাগুলো। ব্যাস! ফুলি ফিরতি পথ ধরবে। খালি গাড়ি। মোষ দুটিকে সে ঘোড়ার মতো দাবড়িয়ে বাড়ি ফিরবে।

মোষের গাড়িতে চড়লে ফুলির গলায় সব সময়ই গান উঠে আসে। নির্জন এই ঠাঁ ঠাঁ দুপুর বেলায়ও তা আসলো। দুপাশ জোড়া খোলা মাঠ। মাঝখান দিয়ে সোজা চলে গেছে জেলা বোর্ডের এই ধুলো ওড়া পথটা। বৈশাখি পাগলা হাওয়া। ফুলি তাই গলা খুলে গাইতে শুরু করেছে। সময় পেলেই সন্ধ্যার পরে গ্রামের মল্লিক বাড়িতে গিয়ে টিভি দেখে সে। ওখান থেকে শেখা গানগুলোই সে গাইতে পছন্দ করে বেশি। বেশ কটি হিন্দি গান তার মুখস্থ আছে। অর্থ বোঝে না, গাইতে পারে চমৎকার। নিজেদের বাড়িতে টিভি তো দূরে থাক- বিদ্যুৎ পর্যন্ত নেই। বাজান বলেছেন- আগামী দু-এক বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ আনবে বাড়িতে, সস্তা একটা টিভিও কিনবেন। কিনতে তো বাজান আগেই পারতেন। সুন্দরবনের বাওয়ালি আর মৌয়াল ছিলেন তিনি। ভালোই ইনকাম হতো ওখান থেকে। পাঁচ বছর আগে বাবার পাশ থেকে এক মৌয়ালিকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল একটা ভয়ংকর মানুষখেকো বাঘে। বাজান এমন ভয় পেয়েছিলেন যে, বাড়ি ফিরে প্রচণ্ড জ্বর হয়েছিল তার। মরো মরো দশা। তারপর থেকে বনে যাওয়া ছেড়ে দিলেন। একজোড়া মোষের বাচ্চা কিনলেন। নিজেদের ওই বাড়িটুকু ছাড়া আর কোনো জমি নেই। তাই তো বলে-কয়ে বাড়ির কাছের ৬ বিঘা ধানী জমি বর্গা নেওয়া হারুন হাজির কাছ থেকে।

ফুলি যেন উড়ে চলেছে। উড়ছে ধুলো। পথের দুপাশেই বড়ো বড়ো তাল-খেজুর গাছের সারি। চোখে পড়ে দু-একটা পলাশ ফুলের গাছ। তবুও রোদে তার শরীর পুড়ছে। ঘামছে। মাথার উশকোখুশকো চুলের বোঝায় ধুলোর আস্তরণ। শিমুল ফুল চোখে পড়েনি এখনো। পলাশের রূপেই সে মুগ্ধ। অন্য সময় হলে সে গাছে চড়ে পলাশ ফুল পেড়ে মাথার চুলে গুঁজত। মায়ের জন্যও নিয়ে যেত কিছু রক্তলাল ফুল। মুখে তার গান ফুটেছে, 'ও পলাশ, ও শিমুল ...।' মোষ দুটো বারবার গলার লাগাম-রশির টান খাচ্ছে। ফুলির হাতের জালিবেত মাঝে মাঝে পড়ছে ওদের পিঠে। লেজেও ঘন ঘন মোচড় দিচ্ছে ফুলি। মোষ দুটি তাই ক্লান্ত খুব। গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা। নাক-মুখে ফেনা জমেছে। জল দেখলেই শরীর জুড়োবার জন্য লাফিয়ে নামবে জলে।

একটা মোড় নিতেই বাঁ পাশে পড়ল বিখ্যাত 'খান পুকুর'। পীর খান জাহান আলীই একদিন এই এলাকার জনগণের জলকষ্ট দূর করার জন্য ও প্রচণ্ড খরার দিনে যাতে কৃষকরা জমিতে জল দিতে পারে সেজন্য খনন করেছেন এই মাঝারি আয়তনের পুকুরটি। ওই পুকুর দেখেই মোষ দুটি নাকে শব্দ তুলল ভুসভাস। ফুলি খুবই সতর্ক হলো। লাগাম-রশি টেনে ধরল কষে। কিন্তু বাগ সে মানাতে

পারল না। মোষ দুটি পাগলা মোষের মতো শিং-এ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি তুলল, কয়েকটি খাড়া লাফ দিল। পরমুহূর্তেই রেসের মোষের মতো লেজ উঁচিয়ে দৌড়ে ১৫/২০ হাত এগিয়েই নেমে গেল পুকুরের ঢালু পাড় বেয়ে। জলে আর লাফ দিতে হলো না, পেছনের ভারি গাড়ির বোঝার ঠেলায় মোষ দুটি জলে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ধান বোঝাই ভারি গাড়িটাই ওদের ঠেলে জলে ফেলেছে। গাড়ি-মোষ ডুবে গেল, ফুলি সাঁতরাচ্ছে। একটু বাদে মনে হলো, দুটি মোষই তো মরবে ডুবে! তাড়াতাড়ি একটির গলার লাগাম খুলে দিতে পারলেও অন্যটি মারা গেল। ছুটে এল পুকুর পাড়ের আশেপাশের বসতির লোকজন। জ্যান্ত ও মরা মোষ দুটিকে ধরাধরি করে ডাঙায় আনল। গাড়ি আর ধানের বস্তা উধাও জলের তলে। গাড়িসহ ধরাধরি করে বস্তাগুলোও টেনে তোলা গেল ডাঙায়। ধান ভিজে গেছে। আর কোনো কাজ হবে না এই ধানে। ২/৪ দিনের ভেতরই চারা গজাতে শুরু করবে। ফুলি হতভম্ব। কাঁদছে না। কথাও বলছে না। এত বড়ো মোষটা মারা গেল ডুবে! দাম কমপক্ষে ৭০ হাজার টাকা। আর কোনোদিন বাজান এমন একটি মোষ কিনতে পারবে না। জোড়া মোষ আর গাড়ি ভাড়া দিয়েও বেশ টাকা ঘরে আসত! জমিতে লাঙল দিতেও টাকার বিনিময়ে গেরস্থরা মোষ দুটোকে নিত।

লোকজন সব ঘিরে ধরল ফুলিকে। পরিচয় দিতেই সবাই চিনল ফুলিকে, চিনল ওর বাজানকেও। বিশাল ক্ষতি এটা। মরা মোষ পড়ে রইল। রইল গাড়ি ও ধানের ভিজা বস্তাগুলো। এখন রোদে হাজারবার শুকালেও চাল হবে না এই ধানে। হারুন হাজি যে মানুষ! ধানের বদলে হয় ধান দিতে হবে, না হয় নিয়ে নেবে এই জ্যান্ত মোষটি। ৪০ মণ ধানের দাম সে উশুল করবেই।

লোকজনেরা ধরাধরি করে ফুলিকে তুলে দিল জ্যান্ত মোষটার পিঠে। ধান-গাড়ি আপাতত থাকবে এখানকার মেম্বরের জিম্মায়।

ক্ষুধার্ত-ক্লান্ত মোষটা যখন ক্লান্ত-শ্রান্ত ও উদভ্রান্ত ফুলিকে পিঠে নিয়ে ফুলিদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, তখন দুটি প্রাণীরই শরীর ধুলোর আচ্ছাদনে ঢাকা। মা দৌড়ে এলেন। বাবা এলেন লাঠি ভর দিয়ে। ফুলি নির্ভয়ে বলে গেল সব। মা আর্তচিৎকার দিয়ে মাটিতে বসে বুক চাপড়াতে শুরু করলেন। বাজান বিশ্রী গাল ঝেড়ে হাতের লাঠিখানাই ছুঁড়ে দিলেন মেয়ের দিকে, প্রচণ্ড বেগে ফুলির কপালে লাগতেই চিৎকার দিয়ে সে পড়ে গেল মোষের পিঠ থেকে। মা ছুটলেন গাছি দা আনতে। আজ মেয়েকে তিনি কেটে কুচি কুচি করবেন।

ফুলি দৌড় দিয়ে দক্ষিণের খোলা মাঠটায় নেমে পড়ল। দৌড়ালো অনেকক্ষণ। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ। মাথা ভোঁ ভোঁ। এই মাঠটি যেন রূপকথার সেই তেপান্তরের মাঠ। মাঝেমধ্যে দু-একটা তালগাছ। বাবলা গাছ। সারি সারি হিজল-করচ গাছ। বর্ষাকালে এই মাঠটা যেন সাগর হয়ে যায়।

ফুলি হাঁটছে দক্ষিণ দিকেই। ওদিকেই আছে ছোটো নদী-শাপলা। শাপলা নদীর কাছাকাছি এক জায়গায় এই তল্লাটের শ্মশান খোলা। বিশাল

একটি পাকুড় গাছের তলায়। পাশেই একটি বয়সি শ্যাওড়া গাছ । ঘন ডাল-পাতা। ওই গাছটার তলায়ই এলাকার হিন্দুরা মনসা পূজা দেয়। আশেপাশে কোনো বসতি নেই। নির্জন এলাকা।

এতক্ষণে ফুলির কান্না পেল খুব। বর্গা জমিতে সে নিজেও মোষের হাল চষেছে। ধানের চারা লাগিয়েছে। আগাছা তুলেছে। গরমে পুরো শরীর যেন গলেছে মোমের মতো। শরীরের ঝরা জলে জমির মাটি ভিজেছে। সেই ধান গেল জলের পেটে! কী হবে এখন সংসারের!

না, বাঁচতে চায় না সে আর। বর্গা ভাগের ধান বেচে এবার ঘরের চালায় নতুন গোলপাতার ছাউনি দেবার কথা। না হলে বর্ষাকালে থাকা যাবে না ঘরে। মোষের গোয়ালেরও একই দশা। ঢাকায় থাকা ভাইটিকেও বইপত্র কেনার জন্য কিছু টাকা পাঠানোর কথা 'বিকাশ' করে। সবই গেছে। হারুন হাজি ধান নিয়ে গেলে ঘরে আর একটি দানাও থাকবে না। বাজানের পা-টারও নাকি অপারেশন করাতে হতে পারে। আর সে কিনা মোষদের বাগে রাখতে পারল না! সব দোষ তার! না, এত কষ্ট সে সইতে পারছে না আর।

না, সে আর বেঁচে থাকবে না। মনসা খোলার শ্যাওড়া গাছটিতে চড়ে বসবে। সাপে কাটুক। ভূতে গলা টিপুক। রাক্ষস এসে গিলে খাক।

পাকুড় গাছটার ঘন ডাল-পাতার ভেতরে উঠে যুৎসই হয়ে যখন বসল ফুলি, তখন প্রায় নেমে গেছে সন্ধ্যার অন্ধকার, শিয়ালরা দূর ও নিকট থেকে ঘোষণা করে দিয়েছে সন্ধ্যাপ্রহর। ঘন পাতার ফাঁক দিয়েও সে সদ্য উদিত চৈতি পূর্ণিমার চাঁদটিকে দেখতে পাচ্ছে। এই চৈতি পূর্ণিমার রাতে তাদের এক চিলতে উঠোনের পাশের নারকেল তলায় হোগলার পাটি পেতে বাজান সুন্দরবনের কত গল্প যে শুনিয়েছেন! আজো শোনাতেন। কিন্তু কপাল খারাপ ফুলির। আসুক পরি। তুলে নিয়ে যাক পরিরাজ্যে। সেখানে সে দাসি হয়ে থাকবে। আসুক কেউটে সাপ। এই জ্বালার চেয়ে কেউটের বিষের জ্বালা বোধহয় কম। রাক্ষস এসে ফেলুক গিলে। বাঁচতে চায় না সে। বুঝুক এখন বাপ-মা! দেখি সংসারের কাজ কে এখন করে!

ফুলির খুব ঘুম পাচ্ছে। একটু-আধটু ভয়ও করছে। আশেপাশের দু-চার মাইলের ভেতর কোনো জনবসতিও নেই। চৈতি বাতাস বইছে চোখে ঘুম নামানো। ক্ষুধার্ত মোষটা কী খেয়েছে! মোষেদের চোখ দুটোতে এমনিতেই সব সময়ে দুঃখ দুঃখ করুণ একটা ভাব লেগে থাকে। পেটে খিদে থাকলে সেটা আরো করুণ হয়। মা-বাজান কী করছেন এখন! ফুলিকে খুঁজছেন বন-বাগানে! এবাড়ি-সেবাড়ি! মরুক খুঁজে। বুঝুক ঠ্যালা!

> ফুলি কোনোদিন স্কুলে যায়নি। শৈশবটা কেটেছে তার ছাগল-গরু চড়িয়ে। বিল-ঝিল-খালে ও নদীতে মাছ ধরে ধরে। মায়ের সঙ্গে গ্রামের গেরস্থ বাড়িগুলোতে কাজকর্ম করে করে। ফুলি ধানমাড়াই থেকে শুরু করে ধান শুকানো-সেদ্ধ পর্যন্ত করতে পারে। তাল-খেজুরের রস জ্বাল দিয়ে গুড়-পাটালি বানাতে পারে। গরুর জন্য বটিতে ফেলে কুটো কাটতে পারে। মোষের পিঠে চড়ে নদী-খাল পাড়ি দিতে ওস্তাদ।

দূরে কাদের কথাবার্তা যেন! চোখ খোলে ফুলি। পাশ ফিরে বসে। নদীটার দিক থেকেই কজন মানুষ হেঁটে এদিকেই আসছে! ফকফকে চাঁদের আলোয়ও ওদের লাগছে ছায়ামূর্তির মতো। সর্বনাশ! প্রথমেই তার মনে হয়– সুন্দরবনের ভয়ংকর ডাকাত এরা। জেলে-বাওয়ালি-মৌয়ালদের অপহরণ করে, জিম্মি করে, টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেয়, না হয় খুন করে ফেলে। নাকি এরা সুন্দরবনের চোরা শিকারি! বাঘ-হরিণের মাংস-চামড়া পাচার করে এরা। সুন্দরবন থেকে মাঝে-মধ্যে বাঘ-হরিণের জ্যান্ত বাচ্চাও নিয়ে আসে! বাজানের কাছে সে এদের কথা বহুবার শুনেছে। ফুলির নানাজানও সুন্দরবনের জেলে। সমুদ্রের জেলে। নানাজানের মুখেও ফুলি এই সব দুর্ধর্ষ দস্যুদের ভয়ংকর রোমহর্ষক গল্প শুনেছে।

কাছাকাছি আসতে বোঝা গেল, দলে মোট ৮ জন। সবার পরনে কালো পোশাক। ওরা যেন ইচ্ছে করেই এসে বসল এই শ্যাওড়া গাছটার তলায়। চারপাশের ছিটকা ও শাটিঝোঁপের বেষ্টনীর ভেতরে। ফুলি হিম-পাথর এখন। একজন জোরালো টর্চের ফোকাস ফেলল। আঁতকে উঠল ফুলি। একটি ৫/৬ বছর

বয়সি ছেলে একজনের কোলে- ঘুমে বিভোর ছেলেটি। ওকে ঘাসের উপরে চিৎ করে শুইয়ে দেওয়া হলো। টর্চের ফোকাস ওর মুখখানাতে ধরা। টর্চধারীই বলল, 'হুশ ফিরবে তাড়াতাড়ি। তখন খাইয়ে দিতে হবে জোর করে। আবারো পুশ করতে হবে ঘুম পাড়ানি ইনজেকশন।' কার হাতের মোবাইল ফোন যেন বেজে উঠল এসময়। লোকটা রিসিভ করল। কর্কশ স্বরে বলল, 'কী ব্যাপার মিস্টার মাহবুব! ছেলেকে কি চাস – না চাস না! আর দেরি হলে আমরা কিন্তু সুন্দরবনে ঢুকে পড়ব। তোর একমাত্র আদরের পুত্তুরকে বাঘ দিয়ে খাওয়াব। তখন ঢাকার মুগদাপাড়ার ছ'তলা বাড়িটাকে ধুপধুনো দিয়ে পূজো করিস, কাড়ি কাড়ি টাকা বিছিয়ে বিছানা করে সুখের ঘুম দিস ...!'

ও প্রান্ত থেকে কী কথা বলল, শুনতে পেল না ফুলি। আবারো এই লোকটা বলল, ঢাকা থেকে খুলনা আসতে কত ঘণ্টা লাগেরে ... বাচ্চা! কোথায় আসবি তা মনে আছে তো! ইঞ্জিন বোট পাবি রূপসা ঘাটে। একাকী আসবি। গোয়েন্দা পুলিশ কিন্তু আমার মোবাইল ট্র্যাকিং করছে সর্বক্ষণ। দু ঘণ্টার ভেতরে না এলে কিন্তু আমরা সুন্দরবনে চলে যাব। তুই ... ফিরে যাবি ঢাকায়।

এরপরে ওপাশের কথা শুনল লোকটি। হু হা করল। তারপরে ব্যাঘ্রগর্জনে বলল, ... বাচ্চা! পুলিশকে তুই ইনফর্ম করিসনি! তাহলে পুলিশ হেডকোয়ার্টার কেন আমাদেরকে ধরিয়ে দিতে – তোর ছেলেকে উদ্ধার করার জন্য সারা দেশ চষে বেড়াচ্ছে, অ্যা! গত দশদিনে আমরা তিরিশবার জায়গা বদল করেছি। সিম বদল করেছি ৪০ বার। সেটও বদল করেছি। ঢাকা থেকে গাজীপুর। তারপরে খাগড়াছড়ি-ফেনী-মুন্সিগঞ্জ-বাগেরহাট হয়ে মংলা বন্দর। তারপরে এখানে। শোন ... বাচ্চা, আমাদের মাথার মূল্য এখন ৫ লক্ষ টাকা, আর তোর ছেলের মূল্য জীবিত অবস্থায় ১০ লক্ষ টাকা। তোর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনরা ফেসবুকসহ পত্রিকায়-টিভিতে তোর ছেলের ছবিসহ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে, সবগুলো টিভি চ্যানেলে বারবার প্রচারিত হচ্ছে, – জীবিত উদ্ধার যে করতে পারবে, তাকে বা তাদেরকে দেওয়া হবে ব্যক্তি উদ্যোগে ৩ লক্ষ টাকা। ২০ লক্ষের আর বাকি থাকে কত? ২ লক্ষ টাকা। তা, ওই দুই পূরণ করে ২০ লাখ আমাদের দিলেই তো পেয়ে যাস তোর ছেলেকে।

ওপাশের কথা আরো কিছুক্ষণ শুনল লোকটি। তারপরে বলল, রূপসা নদী থেকে ইঞ্জিন বোট পড়বে ছোটো শাপলা নদীতে। চালককে বললেই তোকে নামিয়ে দেবে শ্মশান খোলার কাছে। টাকার ব্যাগ নিয়ে একাকী এসে ঢুকবি পাকুড় গাছটার তলায়। আমরা ঠিক দু ঘণ্টা থাকব এখানে।

বলেই লোকটা লাইন কেটে দিল। টর্চ ফেলে ঘুমন্ত-বেহুঁশ ছেলেটিকে দেখল আবার। সময় গড়াচ্ছে। ১৫/২০ মিনিট বাদে চোখ খুলেই ছেলেটি মা মা – মায়ের কাছে যাবো, মায়ের কাছে যাবো' বলে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে শুরু করল। একজনে ওর মুখ চেপে ধরল। আরেকজনে বাঁ হাতে পিস্তল বের করে ডান হাতে থুতনি চেপে ধরে মুখে পাউরুটি আর পাকা কলা ঢুকিয়ে দিতে লাগল জোর করে করে – হাট-বাজারের মুরগি ব্যবসায়ীরা এভাবেই ফার্মের মুরগির মুখে খাবার ঢুকিয়ে দেয়। খাওয়া নয় – গেলা হলো ছেলেটির। বসে কাঁপছে থরথর করে। মা মা বলে চেঁচাচ্ছে। এসময় অন্য একজনে ঘুমের ইনজেকশন পুশ করল ওর ডান হাতে। ছেলেটি যেন ঢলে-ঢলে পড়ল। চিত করে শুইয়ে দেওয়া হলো ওকে। মুখে ফেনা।

ফুলি কাঁপছে থরথর করে। ঘামছে দরদর। বুকের ভেতরে তবলার বোলচাল। ভুল করেও ওরা যদি টর্চের ফোকাস ফেলে ওপরে দেখে ফেলতে পারে! ঘন পাতার জন্য নাও দেখতে পারে। সে বুঝে ফেলেছে সবকিছু। এই শিশুটিকে অপহরণ করেছে এরা। এরা পেশাদার অপহরণকারী। শিশুদের তো বটেই – ধনী লোকদেরও অপহরণ করে, জিম্মি করে, মুক্তিপণের টাকা নিয়ে ছেড়েও দেয়। অপহরণকারীদের সব কথাবার্তা শুনে ও বুঝে ফুলি এখন ভয়ে এমনভাবে কাঁপছে যে, এই বুঝি পড়ে যায় গাছতলায়!

ওরা উত্তেজিতভাবে কথা বলতে বলতে গাছতলার ঝোপ বেষ্টনীর বাইরে চলে গেল। প্রচুর কথাবার্তা বলছে ওরা। এখানে ওখানে ফোন করছে। উত্তেজিত সবাই। আসছে শিকার! এটা ঠিক যে, এই শিশুটির বাবা পুলিশকে কিছুই জানায়নি। জানিয়েছে শিশুটির নানা-মামারা। নানা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা তো!

ফুলির বুকে যেন সাহস ফিরে এল। সে নিঃশব্দে গাছ থেকে নেমেই ক্রলিং পজিশনে চলে গেল। ক্রলিং সে শিখেছে নানির কাছ থেকে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তার নানির বয়স ছিল ৯ বছর। ওই

বয়সে নানি তাঁর বাজানের মোষের গাড়ি চালাতে পারত। নানির বাপের বাড়ি হলো রামপালে। রামপাল টু চালনা পথে নানির বাজান গেরস্থদের ধান-চাল-পাট-গুড় পরিবহন করত। নানিও করত। মুক্তিযুদ্ধের সময় ন'বছর বয়সী নানিও ধান-চালের বস্তায় ও পাটের স্তূপের তলায় নিজের অজান্তেই মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র ও গোলা-বারুদ-গ্রেনেড ইত্যাদি বহন করে নিয়ে যেত। নানির বাজান আসগর গাড়োয়ান অস্ত্রপাতি-গোলাবারুদ বেশি থাকলে নানিকেই পাঠাতেন।

হানাদার-রাজাকাররা পুঁচকে মেয়েটিকে চেকই করত না। নানিও জানত না - সে কী বহন করে নিয়ে যাচ্ছে! পথ থেকে ধান-চালের বস্তা নামিয়ে নিত মুক্তিযোদ্ধারা। নানি শুধু জানত, ওদেরই ধান-চাল-পান – নানাতো ওরকমই বলে দিত।

নানি দূরে দাঁড়িয়ে – লুকিয়ে-ছাপিয়ে বেশ কবার মুখোমুখি যুদ্ধ দেখেছিল। গেরিলা আক্রমণ দেখেছিল। কীভাবে ক্রলিং করে এগোতে বা পিছোতে হয়, দেখেছিল তা-ও। দেশ স্বাধীন হবার পরে পাড়ার ছেলে-মেয়েরা মিলে রোজই যখন যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় মাততো, তখন কাঠের রাইফেল- স্টেনগানসহ কত অস্ত্র হাতে নিয়ে ক্রলিংও করতে হতো। নানি বহুবার ফুলিকে গল্প বলার সময় ক্রলিং করে দেখিয়েছেন। নানির বাপ-চাচারাসহ চাচাতো ভাইয়েরা সবাই সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে অস্ত্রপাতিসহ আবার ফিরে এসেছিল এলাকায়। যুদ্ধ করেছিল হানাদারদের বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে।

খুব সাবধানে ফুলি গুইসাপের মতো বুকে হেঁটে ঝোপ বেষ্টনী পেরুল উত্তর দিক দিয়ে, অপহরণকারীরা রয়েছে দক্ষিণ পাশে। অস্থির পায়চারি ওদের, ঘন ঘন ফোন আসছে-যাচ্ছে। ওরা উদগ্রীব হয়ে আছে ইঞ্জিন বোটের শব্দ শোনার জন্য। কষ্টকর ক্রলিং করল সে প্রায় ৫০০ গজ ফাঁকা জায়গা। বুক ফেটে যাচ্ছে পিপাসায়। জল মিলবে সামনের ছোটো

খালটায়। এতক্ষণে দাঁড়িয়েই দৌড় শুরু করল সে বাড়িমুখো। মাথার ভেতরে চিন্তার ঝড়। বুকের ভেতরেও ঘূর্ণিঝড়।

খালটার পাড়ে এসে উবু হয়ে বসল সে। জল পান করল গরুর জল পান করার কায়দায়। উঠে দাঁড়িয়ে খালের জল মাড়িয়ে আবারো দৌড়। তেপান্তরের মাঠটা পারলে সে উড়েই পাড়ি দিত।

নিজেদের বাড়ির সামনে দিয়ে গেল বটে- বাড়িতে ঢুকল না। তাদের উঠোনে লোকজনের জটলা। হই-হল্লা। মা-বাজানের কান্নাকাটি- কোথায় গেল মেয়েটি!

না, দাঁড়াল না ফুলি। সিকদার বাড়িতে ঢুকল। কাচারি ঘরের সামনে রাখা সিকদার কাকার নড়বড়ে-পুরনো বাইসাইকেলটা নিয়েই চড়ে বসল তাতে। উড়ে চলল উপজেলা সদরের দিকে। থানায় যাবে সে।

বেশি দেরি হলো না। ওসি সাহেব ফুলিকে বেশ সময় নিয়ে জেরা করলেন। তারপরে ফুলিকে নিয়েই জিপে নিজের পাশে বসিয়ে ফোর্সসহ রওয়ানা দিলেন তেপান্তরের মাঠের উদ্দেশ্যে।

অন্য পথে এসে জিপ বহর থামল তেপান্তরের মাঠের পাশে। এখন হেঁটেই পাড়ি দিতে হবে মাঠ। পৌঁছতে হবে শ্মশান তলায়।

মাঠে নেমে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে চলল পুলিশ-বাহিনী। ফুলি ওসি সাহেবের পাশে পাশে। দৌড়াতে দৌড়াতে বলছে ফুলি, 'স্যার! আপনারা কী করতি চাচ্ছেন! আপনাগে প্লান কী?'

'কেন, গিয়ে ঘিরে ফেলব ওদের, গোলাগুলি শুরু করব, পাকড়াও করব শালাদের।'

'স্যার, ওইগে কাছেও ম্যালা অস্ত্রপাতি দ্যাখলাম। ওরাও কাউন্টার অ্যাটাকে আসপেনা? খোলা জাগা। পারবেন আপনারা?'

ওসি সাহেব যেন হোঁচট খেলেন- এতটুকুন মেয়ের মুখে মুখে কাউন্টার অ্যাটাক! কথাটা ও ঠিকই বলেছে। দাঁড়ালেন তিনি। দাড়ালো ফুলি। দাঁড়িয়ে গেল কনেস্টেবলরাও। ওসি সাহেব ফুলির ঘাড়ে হাত রেখে বললেন, 'কাউন্টার অ্যাটাক তুমি কার কাছ থেকে শিখলে, ফুলি?'

ফুলি শিউলি ফুলের মতো হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমার নানির কাছ থেইকে শিখিছি। আমার নানিতো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মোষের ধান-পাট-নারকেল বোঝাই গাড়িতে লুকোইয়ে মোংলা- দিগরাজ সহ কত জায়গায় অস্ত্রপাতি বয়ে লইয়ে যাতো। নানা ছিল সুন্দরবনের মুক্তিযোদ্ধা। বাঁইচে আছে আজো।'

ওসি সাহেব হতভম্ব। ফুলি আবারো বলল, 'স্যার! ফকফকে দুধ-জোছনা চারপাশে। আমরাতো কাছাকাছি যাবার আগেই ওরা দেইখে ফেলাবেনে আমাগে। গুলি কইরে শোওয়াইয়ে দেবেনে। ফাঁকা মাঠ। অ্যাম্বুশ নেওয়ার মতো জাগাওতো নেই। করবেন কী এহন?'

ওসি সাহেব আবারো প্রচণ্ড একটা ধাক্কা যেন খেলেন! তাইতো! শীর্ষ সন্ত্রাসীর তালিকাভুক্ত ওই বশীর ঢালীকে পাকড়াও করে দেশে একটা হইচই ফেলে দেয়া, প্রমোশন বাগিয়ে নেওয়া আর লোভনীয় পুরস্কারের লোভে তিনি তো হুশ-জ্ঞানই বোধহয় হারিয়ে ফেলেছেন! বললেন, 'ফুলি, তাহলে কী করা যায় এখন?'

'মাথা নিচু করে ছড়াইয়ে-ছিটিয়ে ক্রলিং কইরে আগোতি হবে। কাছাকাছি যাইয়ে আপনারা পজিশন লইয়ে চওড়া চওড়া আইলের আড়ালে গুইসাপের মতো শুইয়ে থাকপেন।'

'তাতে লাভ কী' – বললেন ওসি সাহেব, 'ওই ভদ্রলোক এসে যদি টাকা দিয়ে ছেলেকে নিয়ে নেয়, আর ওরা শাপলা নদী পাড়ি দিয়ে চলে যায় সুন্দরবনের দিকে, তাহলে?'

'তাহোলি কী গোলাগুলি করতি চাচ্ছেন?'

'তাছাড়া উপায় কী?'

'তাতে লাভ তো কিছু হবে না স্যার! গোলাগুলির মধ্যি পইড়ে ফেরেশতার মতো ছোয়ালডা যাবে মইরে।'

'অ্যাটাক করা ছাড়া তো উপায় নেই, ফুলি!'

'আরে স্যার! অ্যাটাক না কইরেও গেরিলা কৌশলে যুদ্ধে জেতা যায়। নানা আমারে মুক্তিযুদ্ধের ম্যালা গল্প কইছে। এহন খাটাতি হবে গেরিলা কৌশল। নাহোলি ছোয়ালডারে যেমন বাঁচানো যাবে না, তেমনি লাখ লাখ টাকার পুরস্কারও পাওয়া যাবে না। তয় আমার মাথায় একটা প্লান আইছে!'

'বলে ফেলাও।'

'স্যার! ছোয়ালডাতো ঘুমাতিছে। আমি ক্রলিং কইরে যাই। দেখি –– যদি ওরা একটু দূরি থাকে, তাহোলি ছোয়ালডারে লইয়ে পলাইয়ে আসতি পারি কিনা?'

'দেখে ফেললে কিন্তু গুলি করে ওরা এই ফুলির মাথার খুলি গুড়িয়ে দেবে।'

ফুলি এবার ওসি সাহেবের উদ্যত পিস্তলটার উপরে হাত রেখে বলল, 'স্যার! আমরাতো মইরেই আছি। জীবনের সাথে লড়তি লড়তি ক্ষয় হইয়ে গেইছি। গরিব মানুষ আমরা। আমরা কী ভয় পাই মরনেরে! হয় জয়, নয় ক্ষয়। যদি সফল হই, তাহোলি যে পুরস্কার পাব, তাতি আমরা আবার বাঁইচে উঠতি পারব! মোষ কিনতি পারব। ঘরে চালা দিতি পারব! দুই-পাঁচ বিঘে জমি কিনতি পারব। বাজানের চিকিৎসা করতি পারব। স্যার, জীবনের জন্যি মরণের সাথে বাজি ধরতি হয়। আমিও আজ সেই বাজি ধরব। স্যার, আমার পরদাদাও ছিলেন সুন্দরবনের মৌয়াল। ইংরেজ নীলকর সাহেবরা তাঁর সম্বল ৫ বিঘা ধানী জমিতে নীলচাষের জন্যি দাগ কাইটে দিল। তখন সেই পরদাদা রক্ষে পাইলেন সুন্দরবন থেইকে দুধ খাওয়া দুইটে বাঘের বাচ্চা আইনে দিয়ে। বাঘটা বাচ্চা একটা হুদোঝোপে রাইখে একটু দূরি গেইলো শিকার করতি। ওই সুযোগে গেওয়া গাছে ওত পাইতে বইসে থাকা আমার সেই পরদাদা গাছ থেইকে নাইমে ক্রলিং কইরে যাইয়ে দুইটে বাঘের বাচ্চারে চটের থলিতে ভইরে যেই না দিছে উল্টো দৌড়, তখন বাচ্চা দুইটে দিছে চিৎকার। মা বাঘ হাঁক ছাইড়ে আসতি আসতি পরদাদা আবার সেই গেওয়া গাছটার মাথায়। ক্রুদ্ধ বাঘিনী গাছ তলায় এসে সে কী হম্বিতম্ব! না, পরদাদা কোমরে-গাছে গামছা বেঁধে টানা ১৭ ঘণ্টা গাছে। বাঘিনী হুদোঝোপে থাকা একটি মাত্র ছানাকে ঘাড় কামড়ে ধরে দূরি চইলে যাবার পরে পরদাদা নামিল গাছ থেইকে। বাড়ি ফিইরে ফিডারে গরুর দুধ খাইয়ে বাচ্চা দুইটেরে হৃষ্টপুষ্ট কইরে দিয়ে আইলো সেই নীলকর সাহেবরে। নীলকর বাচ্চা দুইটেরে পাঠাইয়ে দিল জাহাজে কইরে লন্ডনে। পরদাদার ৫ বিঘে জমিতো বাঁচলোই -- উল্টে সাহেব পরদাদাকে দিল আরো ২০ বিঘা জমি লিইখে।' এটুকু বলে একটু থামল ফুলি, সুন্দর একটা হাসি মুখে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'যাই স্যার। হয় মরণ, না হয় জেবন।'

বলেই ফুলি ক্রলিং পজিশনে চলে গেল। ওভাবে রওয়ানাও দিল। ওসি সাহেব তার বাহিনীসহ থ।

'স্যার, মনে কইরেন না যে, টাকার লোভে যাতিছি আমি,' পেছনে ঘাড় ফিরিয়ে বলল ফুলি, 'ছোয়ালডার মুখ দেইখে আমার মায়া পইড়ে গেইছে! কী কচি মুখ! ঠিক এরকম একটা ভাই আমার চার বছর আগে পুকুরি ডুইবে মইরে গেইল। আমার সেই ভাইটাই যেন ও! ওরে বাঁচাতি পারলি মনে আমি ম্যালা সুখ পাব। যদি আমি মইরে যাই, আমার লাশটা বাড়িতে পৌঁছে দিয়েন। নাহোলি আমার মা-বাজান বাঁচপে না।'

ওসি সাহেবের চোখে যেন জল ছলকে বেরুল।

প্রায় ছশো গজ খোলা মাঠ ফুলি পাড়ি দিল শিকারি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতো ধীরে ধীরে, বেশ ক'বার ক্রলিং করেই। বেশ কবার জিরিয়ে নিলো সে। আইলের আড়াল নিলো। হিজল-করচের আড়াল নিলো। কেয়াঝোপের ভেতরে ঢুকে জিরিয়ে নিলো। ওসি সাহেবের দেওয়া জলের বোতল থেকে জল পান করল।

ঝোপ বেষ্টনীর ভেতরে লোভী শিয়ালের মতো মাথা ঢুকিয়ে দিল ফুলি। একজন মাত্র অপহরনকারী ছেলেটির পাশে কাত হয়ে শুয়ে আছে। ডানকাতে শোয়া। ছেলেটি বাঁ পাশে। মাথার কাছে রাখা ছোটো-খাটো একটি রাইফেলের মতো অস্ত্র। লোকটা ঘুমোচ্ছে নাক ডাকে। অন্যরা দূরে অস্থির পায়চারী করছে আর মোবাইলে কথা বলছে।

ফুলি ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোল। শিয়ালের ছাগলের 'মড়ি' টেনে আনার কৌশলে ছেলেটির পা ধরে টেনে টেনে এল ঝোপ বেষ্টনীর বাইরে। তারপর ছেলেটিকে ঘাড়ে ফেলে শুরু করল দৌড় ফিরতি পথে।

পুলিশ বাহিনীর কাছে এসে সে পড়ে গেল ধপাস করে। ঘেমে নেয়ে গেছে। মাথার চুল বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। হাঁফাচ্ছে। ছেলেটিকে কোলে নিলো এক কনস্টেবল। পাহারায় রইল দু'জন কনেস্টেবল।

ওসি সাহেব বাকিদের নিয়ে ছুটলেন পশ্চিম-দক্ষিণ কোনে। ওপথেই আসবে ইঞ্জিন বোট।

শোনা যাচ্ছে বোটের শব্দ। কাছে আসতেই ওসি সাহেব বোট থামালেন। রাইফেল বাগিয়ে ধরল এক কনেষ্টবল, ও.সি সাহেব বোটম্যানকে ইঞ্জিন চালু রাখতে বললেন- যাতে শ্মশানতলার সন্ত্রাসীরা ভাবে- আসছে শিকার!

অতি দ্রুত সব বুঝিয়ে বলা হলো ক্লান্ত-শ্রান্ত ও সন্তান শোকে কাতর-উদভ্রান্ত ভদ্রলোককে। ৪ জন কনষ্টেবল সহ ভদ্রলোককে ঘুরপথে পাঠিয়ে দেওয়া হলো পেছন দিকে। বোটম্যানও গেল সাথে। প্রহরী কনেষ্টবল দু'জনসহ ফুলিকে পাওয়া গেল। ফুলির কোলে বেহুশ-ঘুমন্ত ছেলেকে দেখে ভদ্রলোক হাতের টাকা ভর্তি ব্যাকপ্যাকটা ফেলে দিয়েই চিৎকার দিলেন

আকাশ ফাটানো, হুমড়ি খেয়ে পড়ে কোলে তুলে নিলেন ছেলেকে। তারপরে পড়ে গেলেন মাথা ঘুরে।

প্রহরীরা রইল। এই মাত্র আসা কনেষ্টবল ৪ জনও ছুটল। ইঞ্জিনবোটে বসেই ওসি সাহেব প্লান সাজালেন। এখন দলে মোট ১৩ জন। এগিয়ে গিয়ে চুপিসারে শ্মশানতলা ঘিরে দাঁড়াতে হবে অর্ধ-চন্দ্রাকারে। ইঞ্জিনবোট চালিয়ে দিলেন। লাফিয়ে নেমে পড়ল ১৩ জন। খালি ইঞ্জিনবোট এগিয়ে চলল সোজা শ্মশানখোলার দিকে।

মাত্র দশটা মিনিট! ফায়ার ওপেন করলেন ওসি সাহেব। ধুন্ধুমার গোলাগুলী। ওরা ইঞ্জিন বোটের শব্দ শুনে সবাই জড় হয়েছিল নদীর ঘাটে। আচমকা আক্রমণে ওরা দিশেহারা হয়ে গেল। কাউন্টার অ্যাটাকে এল। আহত অবস্থায় পাকড়াও হলো সবাই। মোটা দড়ি দিয়ে সবাইকে একত্রিত করে কোমর বাঁধা হলো কষে। ওসি সাহেব ওয়্যারলেস মেসেজ পাঠালেন জেলা সদর বাগেরহাটে। ফকিরহাট সদরেও। তারপরে এগোলেন। মাঝমাঠে আসামীদের দাঁড় করিয়ে রেখে তিনি একাই চললেন ফুলিদের খোঁজে।

ফুলিদের কাছে এসে সব খুলে বললেন। ভদ্রলোক হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন। ছেলেটি ভালোই আছে। ফকিরহাট হাসপাতালে নিলে সুস্থ হয়ে যাবে। ওয়্যারলেসে খবর গেল ঢাকাস্থ পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। খুলনা-বাগেরহাট ও ফকিরহাট প্রেস ক্লাবে। ফুলিকে এতক্ষণে ভদ্রলোক জড়িয়ে ধরলেন। ব্যাকপ্যাকের ২০ লক্ষ টাকা বের করে তার থেকে ৫ লক্ষ টাকা ফুলির সামনে রেখে বললেন, 'সব তোমার ফুলি -- সব তোমার।' ফুলির কোলেই ছিল ছেলেটি। ফুলি উঠে দাঁড়াল ঝট করে। এত টাকা দেখে কাঁপছে সে থরথর করে। ওসি সাহেব ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'এটা তোমার পাওনা ফুলি, নাও। ৫ লাখ টাকা। তোমাদের জীবনটাই বদলে যাবে।'

ফুলি বলে, 'এতো টাকা! ৫ লাখ কত টাকা স্যার! এত টাকা আমি নেব কীভাবে?'

ওসি সাহেব হেসে বললেন, 'অনেক টাকা ফুলি। আরো টাকা পাবে তুমি। বাগেরহাট-ফকিরহাট থেকে আরো ফোর্স আসছে। তুমি না রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলে! যাও যাও – বাড়ি যাও। একে তো তোমার খোঁজে তোমার মা-বাবা হয়ত পাগল হয়ে গেছে এতক্ষণ, তারপরে গোলাগুলীর আওয়াজ শুনে আরো ঘাবড়ে যাবে। ভাববে, তুমিও হয়ত গোলাগুলীর মধ্যে পড়েছ। সব মা-বাবাই এরকম ভাবে। যাও যাও। ফোর্স এলে আমরা তোমাদের বাড়ি হয়ে তারপরে ফকিরহাটে যাব। তখন টাকা নিও। ভয় নেই, সব দায়িত্ব আমার -- টাকার সদ্ব্যবহার যাতে হয়, সে জন্য তোমার নামে আমি ব্যাংকে একাউন্ট খুলে দেবো। যাও, মা-বাবার কাছে যাও। আমরা আসছি।'

ফুলি কোলের ছেলেটির কপালে চুমু খেল। মনে পড়ল সেই ডুবে মরা ভাইটির মুখ। তারপরে তুলে দিল ওর বাবার কোলে। একবার তাকাল ৫ লাখ টাকার দিকে। তারপর শুরু করল দৌড়।

জোছনায় ভেসে যাচ্ছে তেপান্তরের মাঠ। জোরে দখিনা হাওয়া বইছে। ফুলির চুলগুলো উল্টে বারবার ঢেকে দিচ্ছে ওর মুখ-চোখ। ফুলি যেন বাতাস-ঘোড়ায় চড়ে সেই ঘোড়ার লাগাম মুঠিতে ধরে হাওয়ার বেগে ছুটে চলেছে বাড়ির দিকে।

ময়না টিয়া

নাসের মাহমুদ

আমের ছুটি, নেই ইশকুল
নিঝুম দুপুর বেলায়,
বারান্দাতে ব্যস্ত টিয়া
পিঠা পিঠা খেলায়।

গ্রিল গলে ময়না পাখি
টিয়ার পাশেই নামে,
ফুড়ুৎ করে ডাইনে দাঁড়ায়
ফের ফুড়ুতেই বামে।

উৎসাহ দেয় পিঠা খেলায়
কুহু কুহু ডাকে,
দুইজনে খুব ভাব হয়েছে
আজ দুপুরের ফাঁকে।

এটা ওটার প্রয়োজনে
ময়না থাকে হেল্প-এ,
নুনের বয়াম আনল গিয়ে
পাকের ঘরে সেল্‌ফ-এ।

চুলোয় চড়ে রান্না যখন
ময়না আনে কুটো,
হয়নি মিঠে আনল আবার
চিনির বয়াম দুটো।

লবণ চাখে একটি পিঠে
ময়না নিয়ে মুখে,
কুহু কুহু করল কত
পিঠা স্বাদের সুখে।

পিঠা বানান শেষ হয়েছে
এবার খাওয়ার পালা,
সেই আনন্দে ময়না চেঁচায়
কানে লাগায় তালা।

গিন্নি সাজে ময়না পাখি
টিয়াটা হয় ছেলে,
চাকুম চুকুম হলো সাবার
গরমা গরম খেলে।

হাত ধুলো আর টিস্যু নিলো
এবং দাঁতের খিলও–
ফুপু ধরো, এই যে বাবা,
একে ওকে দিল।

মিছেমিছি পিঠে খেলা
মিছেমিছি খাওয়া,
কুহু কুহু ময়না পাখি
খেলার পরেই হাওয়া।

নিমন্ত্রণ

কাজী মোহিনী ইসলাম

গ্রীষ্ম এল ফলের বনে বনে
হাওয়ায় ভাসে মৌ মৌ মৌ ঘ্রাণ
মৌমাছিরা যাচ্ছে নিমন্ত্রণে
করছে মুখে গুন গুন গুন গান!

ভাবছে খোকা কখন ছুটি পাব
মায়ের সাথে গ্রামের বাড়ি যাব
মেঠো পথে চড়ব গরুর গাড়ি
কুটুম হব ছোট্ট মামার বাড়ি!

মামির হাতে নানান রকম পিঠা
মুড়কি মোয়া খাব মজা মিঠা
চিড়ে চিনি খাব দুধ আর খই
নানি দেবেন শানকি ভরে দই!

গাছের ডালে পাড়ব পাকা আম
রঙিন রসের মিষ্টি ঠাসা জাম
আতা কাঁঠাল আনারস আর লিচু
সফেদা বেল জামরুল সব কিছু

পুকুর নদী গ্রামের বিলে খালে
রুই কাতলা বোয়াল ধরব জালে
মাঝির সাথে টানব গিয়ে দাঁড়
মা দেখবেন আমাকে বারবার

বলব মাকে, আমিও গাঁয়ের ছেলে
দিন কাটাব ধুলোয় হেসে খেলে
মা বলবেন উদাসী আনমনে
কোথায় থাকিস, পাহাড় নদী বনে?

স্বপ্ন ও রাত দুই কিশোরী

মোহাম্মদ মারুফুল

জোছনা-ঝিঁ ঝিঁ-জোনাক পোকা
ভাব জমিয়ে গলায় গলায়,
রাতের বেলা জমায় মেলা
নীরব নিঝুম গাছের তলায়।
স্বপ্ন এবং রাত যে তখন
জনান্তিকে খেলায় মাতে;
মিহি ছন্দ কি আনন্দ
বাজিয়ে তাদের পায়ে হাতে।

আকাশ নিচে নেমে থেমে
স্নিগ্ধ শিশির দেয় ছড়িয়ে,
সে-সব শিশির ধীরে ধীরে
হাওয়ায় হাওয়ায় যায় গড়িয়ে।
ঘুম ঘুম ঘুম কি যে নিঝুম
নীরব হওয়া গ্রাম-নদী-বন
নৈশরঙে শুরু করে
নানান রকম দৃশ্য বুনন।

সুর ছড়িয়ে রাতের পাখি
সাজে যখন গীতিকবি,
চন্দ্র শুনে হয় যে মুকুর
ধরতে সেই সে পাখির ছবি।

আমিও ঘুম থেকে জেগে
রাতের পাখির সে গান শুনি,
রাতের পাখির গানের সাথে
গুনগুনিয়ে কাব্য বুনি!
স্বপ্ন ও রাত তখন যেন
আমার কাছে ধরে কায়া;
দুই কিশোরী সেজে যে হয়
কি রহস্যের অপার মায়া।

শিল্পী তুমি

জাফরুল আহসান

রংতুলিতে আঁকার ছবি
শিল্পী তুমি ছবির কবি;
আঁকতে পারো আকাশ নীল
আকাশ নীলে শঙ্খ চিল
শঙ্খ চিলের ডানায় চড়ে
যেতেই পারো তেপান্তরে
তেপান্তরে অচিন মাঠ
মাঠের ধারে ফুলের হাট
ফুলের হাটে গড়াগড়ি
মৌমাছিদের জড়াজড়ি
জড়াজড়ি রংবাহারি
রংবাহারি মেঘের বাড়ি
মেঘের বাড়ি বৃষ্টি ধোয়া
বৃষ্টি ধোয়া হৃদয় ছোঁয়া
হৃদয় ছোঁয়া শিল্পী তুমি
আঁকলে না হয় জন্মভূমি
জন্মভূমি রক্তে লেখা
লাল-সবুজের এক পতাকা।

এক মুঠো সুখ

এইচ এস সরোয়ারদী

ধান শালিক আর কৃষ্ণচূড়া
পাহাড় নদী ঢেউ,
স্বাধীনতার এক মুঠো সুখ
দিবে আমায় কেউ?

ইচ্ছে আমার পাখির মতো
উড়ব ডানা মেলে,
তাতেই খুশি, স্বাধীনতার
এক মুঠো সুখ পেলে।

Pen মানে কী

জাহাঙ্গীর আলম জাহান

থার্ড পিরিয়ড শুরু হলে
ইংরেজি স্যার এসে
ক্লাস করাতে শুরু করেন
একটুখানি কেশে।
মাঝ সারিতে ঝন্টু তখন
বেঞ্চে মাথা রেখে
তন্দ্রা চোখে ঝিমুচ্ছিল
ক্লাসের শুরু থেকে।
স্যার শুধালেন-'এ্যাই ঝন্টু
Pen মানে কী বল'
তন্দ্রা ছেড়ে ঝন্টু দাঁড়ায়
হয়ে সে চঞ্চল।
পেছন থেকে আস্তে করে
পিন্টু বলে 'কলম'
ঝন্টু কানে খাটো বলে
শুনতে পেল মলম।
তাই ঝন্টু 'মলম' বলে
জবাব দিল যেই
ক্লাসের রুমে হাসির ঝলক
ছুটল মুহূর্তেই।
অট্টহাসি, মিচকি হাসি
হাসছে সবাই হো-হো
ঝন্টু তখন পারলে বাঁচে
পালিয়ে ঝিনাইদহ।

পুষি

অমিত কুমার কুণ্ডু

আমাদের পুষি আজ খুব খুশি
ধরেছে ইঁদুর ছানা
এরপর রাতে কাঁটা পেয়ে পাতে
গজিয়েছে যেন ডানা।

রোজ গোলা ঘরে সে ইঁদুর ধরে
বাসি পাতে দেয় হানা
তার বাড়াবাড়ি মাছ কাড়াকাড়ি
সকলের আছে জানা।

ছোটাছুটি করে এ ঘরে ও ঘরে
ম্যাঁও ম্যাঁও ডাকে জোরে
ডাক শুনে তার ভয়ে থাকা ভার
ঘুম ভেঙে যায় ভোরে।

সুস্থ সুন্দর থাকলে হলে

চান মিয়া চান্দু

সুস্থ সুন্দর থাকতে হলে
করতে হবে খেলা,
দেখতে হবে নদী সাগর
হাসতে হবে মেলা।
সকাল বেলা ব্যায়াম
বিকাল বেলা হাঁটা,
সুস্থ থাকবে তবে শরীর
বাড়বে বুকের পাটা।
মিলেমিশে চলতে হবে
ঝগড়া-ঝাঁটি নয়,
স্বাধীনভাবে থাকবে দেশে
ভুলে হিংসা ভয়।
সুস্থ সুন্দর থাকতে হলে
খেতে হবে ফল,
খেতে হবে শাক-সবজি
বিশুদ্ধ জল।
সুস্থ সুন্দর থাকতে হলে
খাবে ছোটো মাছ,
নিজের হাতে করতে হবে
ঘরের কিছু কাজ।
সুস্থ সুন্দর থাকতে হলে
খেতে হবে হাওয়া,
সাঁতার কেটে গোসল করে
পূরণ করবে চাওয়া।
সুস্থ সুন্দর থাকতে হলে
পড়তে হবে বই,
মেনে চললে সুফল পাবে
সবার জন্য কই।

বানর জাদুকর

সৌর শাইন

বনের বড়ো বটগাছটার গোড়ায় ছিল বিশাল এক খোঁড়ল। সে খোঁড়লে বাস করত এক খরগোশ পরিবার।

তাদের ধবধবে সাদা একটি ছানা। খরগোশ ছানাটি দেখতে যেমন বেশ সুন্দর তেমনি খুব চঞ্চল। সারাক্ষণ সে দুষ্টুমিতে ব্যস্ত থাকত আর বাইরে যাওয়ার ফাঁকফোকর খুঁজে বেড়াত। সুযোগ পেলেই দৌড়ে বেরিয়ে যেত। তার পথ আগলে দাঁড়াত মা খরগোশটি। কোলে তুলে নিয়ে বলত-'বাসা থেকে একদম বের হবে না জাদু-সোনা, বাঘ মামা, শেয়াল মামারা দেখতে পেলে হাড়-মাংস চিবিয়ে খাবে।' মায়ের কথা শুনে ছানাটি ভয়ে কুঁকড়ে যেত। মা খরগোশের গলা জড়িয়ে বলত-'ঠিক আছে মা, আমি বাসা থেকে কখনো বের হব না।'

কিন্তু পরদিনই ছানাটি মায়ের কথা ভুলে যেত। তাই মা খরগোশটি ছানাকে সব সময় চোখে চোখে রাখত। একটিবারের জন্যও তাকে বাসা থেকে বের হতে দিত না। বাবা খরগোশ বনের ক্ষেতখামারে ঘুরে ঘুরে মুলা, শালগম, আলু, কপি এসব সবজি সংগ্রহ করে আনত। সে সবজি দিয়ে তিন বেলা তাদের খুব ভালোভাবে চলে যেত। পেটপুরে খেয়ে দিত জম্পেশ ঘুম। এভাবে বেশ সুখে কাটছিল খরগোশ পরিবারের দিন।

তখন চৈত্র মাস। দুপুরবেলা খরগোশ ছানাটি মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে আসে। মনের খুশিতে লাফাতে থাকে এদিক-সেদিক। ছুটতে থাকে বনের ভেতর। ছুটতে ছুটতে সে চলে আসে বনের শেষ প্রান্তে নদীর ধারে। চৈত্রের খরদাহে সে নদীটার করুণ অবস্থা তখন। জল শুকিয়ে চৌচির মাঠ। খরগোশ ছানাটি নাচতে নাচতে নদীর ওপাড়ে চলে যায়। তারপর পেরোতে লাগল একের পর এক মাঠ।

রোদের তাপ সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ছানাটি। মা-বাবার কথা মনে পড়তেই বাসায় ফেরার জন্য সে পা বাড়াল। কিন্তু ততক্ষণে সে ভুলে গেছে কোন পথে সে এসেছিল। চারদিকে কেবল দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। চৈত্রের কড়া রোদে ছানাটির গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। একটু ছায়া পেলে ভালো হতো। কিন্তু এ খোলা মাঠে গাছের ছায়া পাওয়া অসম্ভব। তাই অসহায় ছানাটি বড়ো আলের ছোট্ট ছায়ায় একটু আশ্রয় নিলো। পিপাসায় গলা শুকিয়ে কাঠ। অবসাদ দেহে চোখ বুজে পড়ে থাকে সে।

তখন পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল এক শেয়াল। এত চমৎকার একটা শিকার শুয়ে থাকতে দেখে তো শেয়ালের জিভে জল চলে এল। শেয়াল ধীরে ধীরে এগোতে লাগল খরগোশ ছানাটির দিকে। হাঁ করে ছানাটির গলায় কামড় বসাবে ঠিক এমন সময় কোত্থেকে এক বুড়ো বানর এসে হাজির। বানরটির গায়ে মানুষের মতো পোশাক, কাঁধে বিশাল ঝোলা, মাথার ওপর ছাতা, চোখে চশমা।

অদ্ভুত বানরটিকে দেখে শেয়াল খুব বিরক্ত হলো। বানর এখানে আসা মাত্রই বুঝে ফেলল শেয়ালের মতলব। বলল, 'কী ব্যাপার মশাই, কী করছিলেন শুনি?'

চালাক শেয়াল হা হা করে হেসে বলল, 'আর বলবেন না ভাই, সিংহরাজ আমাকে বনের প্রাণীদের ঘুমপাড়ানোর চাকরি দিয়েছে, তাই তো খরগোশ ছানাটিকে ছড়া বলে বলে ঘুম পাড়ালাম।'

বানর খরগোশ ছানাটিকে শেয়ালের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য মুহূর্তে একটি চালাকির চাল আবিষ্কার করে নিল। বলল, 'বাহ, চমৎকার চাকরি তো এটা। আমার চোখে ঘুম নেই কত দিন ধরে। যদি একটু ঘুম পাড়িয়ে দিতেন আমি ধন্য হতাম।'

শেয়াল ঘুমপাড়ানোর কথা এড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বানর ভাই আপনি কোত্থেকে এলেন বলুন তো?'

বানর উলটো চালাকি করে বলল, 'মশাই, এসেছি ব্রহ্মদেশ থেকে।'

শেয়াল ভুরু কুঁচকে বলল, 'ব্রহ্মদেশ থেকে এসেছেন? কী ব্যাপার বলুন তো? সিংহরাজের দেখা পেতে চান?'

এবার বানর হুংকার দিয়ে বলল, 'দূর বোকা, সিংহরাজের সঙ্গে আমি দেখা করব কেন? আমি সিংহের চেয়েও শক্তিশালী। ব্রহ্মদেশ থেকে জাদুবিদ্যায় ডিগ্রি নিয়ে এসেছি। যাকে তাকে ইচ্ছা করলেই অদৃশ্য করে ফেলতে পারি। বন্দি করে ফেলতে পারি মায়াবী লোহার খাঁচায়।'

শেয়াল বানরের কথাগুলো ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না। বলল, 'তাহলে একটু প্রমাণ দেখান দেখি।'

বানর বলল, 'তবে, আপনাকেই অদৃশ্য করে দেখাই?'

শেয়াল আঁতকে ওঠে বলল, 'না না, আমাকে কেন! খরগোশ ছানাটিকে অদৃশ্য করে দেখান দেখি, আপনি কত বড়ো জাদুকর।'

বানর বলল, 'ঠিক আছে, শুরু করছি বানর জাদুকরের খেলা।'

বানর খরগোশ ছানাটিকে এক হাতে তুলে নিল, অন্য হাতে নিল তার ছাতা। মাঠের মধ্যে শুরু করল তাক-ধিনা ধিন নাচ। আর হিজিবিজি মন্ত্র পাঠ। বানর নাচের তালে তালে ছাতার সুচালো অগ্রভাগটা শেয়ালের চোখের ওপর ঘোরাতে থাকল অনবরত। শেয়াল খানিকটা ভয় পেয়ে গেল। আলপিনের মতো ছাতার এ অংশটা চোখে বিঁধলে তো আর রক্ষে নেই। চিরকালের জন্য অন্ধ হয়ে যেতে হবে। এই ভেবে ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল শেয়াল।

এদিকে এক পলকে খরগোশ ছানাটিকে সযত্নে ঝোলাতে রেখে দিল বানর। তারপর চিৎকার করে বলল, 'দেখলেন তো মশায় ব্রহ্মদেশের জাদুবিদ্যে।'

শেয়াল কিছু বুঝতে না পেরে ভ্যাবচ্যাকা খেয়ে গেল। তারপর বানর রাগে গর্জে উঠল। বলল, 'দুষ্ট শেয়াল তুই আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলছিলি। সিংহরাজ তোকে কোনো চাকরি দেয়নি। ছানাটিকে খেয়ে ফেলার ফন্দি ছিল, তাই না? এখন তোর শাস্তি লোহার খাঁচা।'

শেয়াল লোহার খাঁচার কথা শোনামাত্র 'মা গো... বাবা গো' বলে দৌড়ে পালাল।

এবার বানর খরগোশ ছানাকে আলের ছায়ায় আগের মতো শুইয়ে দিল। ততক্ষণে ছানাটি চোখ মেলে তাকালো।

বানর জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে বেটা তুই এখানে এলি কী করে? এতক্ষণে তো পাজি শেয়াল তোকে খেয়ে

শেষ করে ফেলত। যাক ভালোভাবেই বেঁচে গেলি। কিন্তু এখন তো রোদের তাপে মারা যাবি। আহ, চোখ-মুখ একেবারে লাল হয়ে গেছে।' বানরের কথা শুনে খরগোশ ছানাটি হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। বলল, 'আমি বাসায় ফেরার পথ হারিয়ে ফেলেছি, পিপাসায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।' খরগোশ ছানার করুণ অবস্থা দেখে বানরের মনে খুব দয়া হলো। বলল, 'ওই যে দূরের গাঁ দেখছ। আমি সে গাঁয়ের এক কৃষকের পোষা বানর। আমি সেখানেই থাকি। তুমি আমার ঝোলায় উঠে বস, ছাতার ছায়ায় আমরা যাব, রোদের তাপ ছুঁতেও পারবে না। কৃষকের বাড়িতে গিয়ে তোমাকে জলখাবার খেতে দেব।'

খরগোশ ছানা বলল, 'কিন্তু আমি বাসায় ফিরব কীভাবে? মা-বাবা আমাকে নিশ্চয়ই খুঁজছেন।'

বানর বলল, 'আরে বেটা জল খেয়ে আগে প্রাণটা তো বাঁচাও, পরে না হয় তোমাকে বাসায় পৌঁছে দেব।' খরগোশ ছানা বানরের কথায় রাজি হলো। তারপর তাকে ঝোলায় তুলে, ছাতা মেলে হাঁটা শুরু করল বানর।

কৃষকের বাড়ি এসে ঝোলা থেকে নামল খরগোশ ছানা। বানর তাকে বারান্দায় বসতে দিল, তারপর খেতে দিল জলখাবার, পাকা পেঁপে আর গাজর। খরগোশ ছানা পেট ভরে খেল। কিছুক্ষণ পর বানর জিজ্ঞাসা করল, 'এবার বলো তো তোমার বাসাটা কোথায়? বনের নাম-ঠিকানা ঝটপট বলো দেখি।' বাসার কথা মনে হতেই খরগোশ ছানার মুখ শুকিয়ে গেল। বলল, 'বাসার ঠিকানা তো জানি না।'

বানর বলল, 'সে তো বড়ো মুশকিল, তাহলে তোমাকে বাসায় পৌঁছে দেব কীভাবে? কোন পথ দিয়ে এসেছিলে কিছু মনে পড়ে?'

খরগোশ ছানা ভেবে বলল, 'হ্যাঁ, একটু মনে আছে। বড়ো একটা বটগাছের খোঁড়লে আমাদের বাসা, সেখান থেকে মাকে ফাঁকি দিয়ে এসেছিলাম নদীর পাড়ে, শুকনো নদী পেরিয়ে কোন পথ দিয়ে যে এতদূর এলাম তা তো মনে নেই...।'

বানর মুচকি হেসে বলল, 'মাকে ফাঁকি দিয়ে এসেছিলে... তাই তো এমন শিক্ষা। এবার তবে মাঠ পেরিয়ে নদীর ওপারে যাওয়া যাক... তারপর কোথায় বটগাছ আছে তা খুঁজে বের করতে হবে।'

বিকেল নেমে এল।

বানরের কাঁধে চড়ে বসল খরগোশ ছানা। তারপর শুরু হলো পথচলা।

এদিকে মা ও বাবা খরগোশ প্রিয় সন্তানকে হারিয়ে বড়ো দুঃখের অবস্থা। পুরো বন তন্নতন্ন করে খুঁজল দুজনে। দুপুর কেটে গেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এল। তবু ছানাটির খোঁজ পেল না।

মা-বাবার চোখ ভরে নেমে এল দুঃখের নদী।

ঠিক তখনই দেখা গেল একটি বানর এদিকে এগিয়ে আসছে, তার কাঁধে একটি ধবধবে সাদা খরগোশ ছানা। কাছে আসতেই চিনতে পারল এ তো তাদেরই প্রিয় সন্তান। মা-বাবার কাছে আসতে পেরে খুশিতে কেঁদে ফেলল ছানাটি। মা খরগোশকে জড়িয়ে বলল, 'আর কখনো তোমাকে ফাঁকি দিয়ে কোথাও যাব না মা।'

বানরের কাছে মা ও বাবা খরগোশ পাজি শেয়ালের মতলব ও ছানাটির করুণ অবস্থার কথা শুনল।

বানরের উপকারে মুগ্ধ হয়ে বাবা খরগোশ বানরটির হাত ধরে ধন্যবাদ জানাল।

বিস্কিট দৌড়

তাসনীম বিন আলম

সিমিনের এখন মনটা বেশ খারাপ। কেন? কেন? মন খারাপ কেন? বলছি, তার আগে বলে দেই সিমিন ওয়াই.ডব্লিউ.সি.এ-তে পড়ে। নার্সারিতে। স্কুলে ওর খুব ভালো লাগে। স্কুলে ও সবসময় মন দিয়ে পড়াশুনা করে। নিয়মিত হোমওয়ার্ক করে আসে। তাই স্কুলের মিস'রা সবাই তাকে অনেক আদর করে। সবচেয়ে বেশি আদর করে রিক্তা মিস। ও রিক্তা মিসকে ভীষণ ভালোবাসে। তো গতকাল রিক্তা মিস ক্লাসে এসে বলল, 'আগামীকাল স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার হিট হবে।'

ঈশিতা হাত তুলল। মিস বলল, 'কী ঈশিতা, কিছু বলবে?'

'মিস ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কী?'

'বলছি শোনো। ক্রীড়া মানে এই খেলাধুলা আর কি। আর প্রতিযোগিতা হলো, কী বলব, একজন আরেকজনের চেয়ে ভালো করার চেষ্টা করা। যে সবচেয়ে ভালো করবে সে বিজয়ী হবে। আর যারা যারা জিততে পারবে না তারা আরো আরো চেষ্টা করবে। এই হলো গিয়ে কথা।'

সিমিন এমন সময় জানতে চাইল কী কী বিষয়ে প্রতিযোগিতা হবে। মিস তখন অনেকগুলো মজার মজার খেলার কথা বললেন। এত এত মজার খেলার মাঝে সিমিনের সবচেয়ে ভালো লাগল বিস্কিট দৌড়ের আইডিয়াটা। সিমিন তখন ভাবল কালকে সে এই খেলাটা দিবে, মানে এই খেলাটার প্রতিযোগিতায় সে খেলবে।

আজ স্কুলে এসেই ও সবাইকে বলে দিয়েছে যে ও বিস্কিট দৌড় খেলবে। এশা, তুবা, অবনীরাও এ খেলাটা খেলবে। খেলা শুরুর আগে রিক্তা মিস সবাইকে নিয়মটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। সিমিনও মন দিয়ে বুঝেছে। সহজ-ই তো। দৌড়ে গিয়ে সবার আগে লাফিয়ে বিস্কিটটা খেতে হবে। দৌড়ে তো এমনিতেই সে বেশ ভালো, তার উপরে অন্যদের চেয়ে দু'আঙুল লম্বা।

যা হোক, ওরা সবাই দৌড়ের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে গেছে। মিস গুণলেন ৩ ২ ১ এরপর বললেন, গো। সবাই দৌড় শুরু করল। আর সিমিনকে দেখা যাচ্ছে তাদের সবার সামনে। সবার আগে আগে দৌড়িয়ে সিমিন তখন পৌঁছে গেছে শেষ প্রান্তে। শুধু লাফ দিয়ে কামড়ে ধরবে। ঠিক এমন সময় তার মনে পড়ল, রিক্তা মিস ওদের প্রায়ই বলেন খোলা খাবার না খেতে। যেমনি মনে পড়া, তেমনি দাঁড়িয়ে যাওয়া। সবাই অবাক। ঘটনা কী? সিমিন তখন ডান দিকে রিক্তা মিসকে দেখতে পেয়ে বলল, 'মিস আপনি বলেছেন খোলা খাবার না খেতে।'

ওদিকে তুবা দৌড়ে সিমিনের পাশে এসে হাজির। সিমিনের দেখাদেখি ও দাঁড়িয়ে গেছে।

রিক্তা মিস খুব দ্রুত বলল, 'এটা খাওয়া যাবে, এটা খাও।'

ওমনি তুবা এক লাফে বিস্কিটটা কামড় দিয়ে মুখে পুড়ে নিয়েছে।

জিততে পারেনি তাই বলে সিমিনের একটুও মন খারাপ না। রিক্তা মিস তো বলছেনই সবাই জিততে পারে না। জিততে না পারলে আরো চেষ্টা করতে হয়। 'তাই বলে যে বোকামিটা সে করল, কালকে নিশ্চয়ই সবাই এটা বলাবলি করে হাসাহাসি করবে' এটা ভেবেই সারাটাক্ষণ সিমিনের মন খুব খারাপ।

একাদশ শ্রেণি, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা

ছোট মামা

আমি যে বইটি পড়েছি

কৃণন মাহমুদ নিয়োগী

'ছোট মামা' ছোটোদের উপন্যাস। খুব মজার ও হাসির। এই উপন্যাসে এক দুষ্টু ছেলে অর্চন ও তার জেদি বোন নিশি এবং তাদের ছোট মামা সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাদের ছোটো মামা একজন মজার মানুষ যাকে অর্চন 'গণ্ডার' পদে ভূষিত করে। কারণ, গণ্ডারের মতো তার মামাও ৬ মাসে একবার হাসে। যে কোনো কাজে অর্চন নিশির জেদকে অস্ত্র বানায়। তেমনি গণ্ডার আজকে হাসবে ৬ মাস পর, যা দেখা লাগবেই বলে নিশির জেদ চাপিয়ে অর্চন চিড়িয়াখানায় যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু নিশি গণ্ডার ছাড়া কিছু দেখতে না চাওয়ায় অর্চন চিড়িয়াখানা আর কিছু দেখতে পারে না, ফলে তার যাওয়া বৃথা। কিন্তু সে তার বন্ধুদের ঠিকই দেখে (বানর)।

কয়েকদিন পর ছোট মামার বোন অর্থাৎ অর্চন ও নিশির মা ছোট মামাকে বাজারে যেতে বলে। বাজারে যেতে অনিচ্ছা থাকায় ছোট মামা মূলত অর্চনকে দিয়ে বাজার করায়। কিন্তু বাজারের ব্যাগ চুরি যাওয়ায় তাদের হাতে থাকল শুধু পুঁটিমাছ যা দেখে অর্চনের মা রেগে তাদের ভাত দেন না। অবশেষে অর্চনরা খালি পেটে থাকে। ছোট মামা কোনো কাজ না করায় নিশির মা বলল নিশিকে পড়াতে। কিন্তু নিশিকে পড়াতে গিয়ে ছোট মামার হাসতে হাসতে খারাপ অবস্থা। পড়ার সময় নিশির জেদের জন্য তাকে আর পড়ানো হয় না। অন্য একদিন ছোট মামা খেলাচ্ছলে অর্চনকে টম ও জেরি বানায় কিন্তু অর্চন বলে, টমের বুদ্ধি কম এবং তার বুদ্ধি বেশি। প্রমাণ করতে গিয়ে সে ক্যালকুলেটর নষ্ট করে যার জন্য তাদের বাসায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ছোট মামা অবশেষে ক্যালকুলেটর ঠিক করে।

একদিন দুপুরে বিশ্রামরত অবস্থায় ছোট মামা ফ্লোরে, নিশি জেদ করে সাইকেল নিয়ে গেল তার উপর দিয়ে। নিশি যেমন অর্চনও তাই। সে টম হবেই হবে। সে ভাবল এসি বানাবে। এবং এক গামলা পানি ও টেবিল দিয়ে বানাল ও। কিন্তু বাবা তা দেখে রাগ করে ছোট মামাকে দোষারোপ করে। আর মা তাকে বাসা থেকে চলে যেতে বলেন। পরদিন সত্যি সত্যি ছোট মামা চলে যায়। কিন্তু তাকে খোঁজার জন্য খুব একটা চেষ্টা করা হয় না। এজন্য অর্চন নিশিকে বুঝিয়ে তার সাথে হাঙ্গার স্ট্রাইক করে যার ফলাফল ভয়াবহ হয় এবং পত্রিকায় খবর ছাপা হয়, তাই দেখে ছোট মামা ফিরে আসে। সবাই ভাবত ছোট মামা নিষ্কর্মা কিন্তু একদিন তার ডাক পরে আমেরিকায়। সবার মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। ছোট মামা দেখা যায় আসলে বড়ো একজন বিজ্ঞানী যিনি পানি থেকে গাড়ির জ্বালানি আবিষ্কার করেন।

সপ্তম শ্রেণি, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

মা-বাবা

জুনাইদ তৌহিদ

বাবা করে সাহায্য
মা করে যত্ন,
আমি করি সম্মান।
মা-বাবার সাথে ঝগড়া করি না,
মা-বাবার সাথে মিথ্যা বলি না।
দোয়া করি মা-বাবার।
পূর্ব দিকে ওঠে সূর্য
রাতে ওঠে চাঁদমামা।
মা-বাবা তেমনি আপনজন
সাধারণ মানুষ হলেও তারা ভালো।

৩য় শ্রেণি, এস এম মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

আবার দেখা হবে

ইসরাত মোহনা জামান

আবার দেখা হবে ধানসিঁড়ির ঐ কোলে
ভেসে যায় মোহনার ঐ তীরে,
বুঝতে পারলে আমি কে?
মনের মাঝে এক টুকরো মেঘ জমে,
মনে হয় তুমি আছো।
মনে পড়ে সেই দিনগুলো?
ভেবো না দেখা হবে।
হঠাৎ করে বৃষ্টি এল
সবকিছু মুছে গেল,
হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে যায় এগুলো স্বপ্ন
হলেও সত্যি আমি জানি,
ভেসে যায় মোহনার ঐ তীরে
আমি জানি আবার দেখা হবে।

চতুর্থ শ্রেণি, নিউ চিলড্রেন প্রেস, মহেশপুর, ঝিনাইদহ

গ্রীষ্মের ছুটি

তামজিদ

স্কুল দিলো গ্রীষ্মের ছুটি
করছি মোরা হুটোপুটি
যাব আমরা মামা বাড়ি
চড়ব শুধু গরুর গাড়ি
কাটব সাঁতার বিলে ঝিলে
তুলব শালুক সবাই মিলে
ছুটি শেষে ফিরব বাড়ি
মাথায় নিয়ে স্মৃতির হাঁড়ি ।।

৫ম শ্রেণি, সরকারি আইডিয়াল স্কুল, মতিঝিল, ঢাকা

প্রিয় ক্রিকেটার

মাশরাফি বিন মর্তুজা

রেদ্বওয়ান মাহমুদ

মাশরাফি বিন মর্তুজা। একটা হৃদস্পন্দন জাগানো নাম। আর তিনি আমার প্রিয় খেলোয়াড়। একজন দক্ষ অধিনায়ক হিসেবে মাশরাফির কোনো তুলনা নেই। দলের সুসময়-দুঃসময় সবসময়ই তাঁর অধিনায়কত্ব দেশের মানুষকে সান্ত্বনা দেয়। বোলিং, ব্যাটিং, অধিনায়কত্ব, উল্লাস সবকিছু মিলিয়ে মাশরাফি বিন মর্তুজা আমার খুব প্রিয়। যখনই মাঠে তাঁকে দেখি, মনটা আনন্দে নেচে উঠে। মাশরাফি বেঁচে থাকুক দীর্ঘদিন, দলকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাক অনেক দূর, এটাই আমার কামনা!

একাদশ শ্রেণি, জকিগঞ্জ কলেজ, সিলেট

মোবাইল অ্যাপ 'মাশরাফি দ্যা ক্যাপ্টেন'

বাংলাদেশের ক্রিকেটে এক জনপ্রিয় নাম মাশরাফি যিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে এনে দিয়েছেন একের পর এক সাফল্য। যে সাফল্যে আজ গোটা বিশ্ব বাংলাদেশকে সমীহের দৃষ্টিতেই দেখে। কিন্তু গত ৪ মার্চ টি-টোয়েন্টি থেকে মাশরাফি বিন মর্তুজার হঠাৎ অবসরের ঘোষণায় কান্নায় ভেঙে পড়েন তার ভক্তরা। বাংলাদেশ ক্রিকেটের এই সূর্য সন্তানকে সম্মান জানাতে তার জীবনী নিয়ে মোবাইল অ্যাপ প্রকাশ করেছে ৭১ *ল্যাব*। নাম দিয়েছে 'মাশরাফি দ্যা ক্যাপ্টেন'।

'মাশরাফি- দ্যা ক্যাপ্টেন' নামে মোবাইল অ্যাপটি গুগল প্লেস্টোরে পাওয়া যাচ্ছে এই ঠিকানায় (goo.gl/ hRy8jO)।

অ্যাপটিতে রয়েছে মাশরাফির সংক্ষিপ্ত জীবনী, মাশরাফির উক্তির সংকলন, মা-বাবার মুখে মাশরাফির গল্প, দুর্লভ কিছু ছবি ও তার বিভিন্ন ম্যাচের পরিসংখ্যানসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। যা তার ভক্তদের অনুপ্রেরণা জোগাবে। সবার প্রিয় এই ক্রিকেটার সম্পর্কে যেন সবাই খুব সহজেই জানতে পারে সেজন্যই অ্যাপটি বাজারে আনা হয়েছে। যা অফলাইনেও ব্যবহার করা যাবে।

অ্যাপটির ডেভেলপার ফেরদৌস বলেন, মাশরাফির প্রতি সম্মান আরো ভালোবাসা থেকে এই অ্যাপটি বানানো হয়েছে। এই অ্যাপটির মাধ্যমে ক্রিকেটপ্রেমীরা খুব সহজেই মাশরাফি সম্পর্কে ধারণা পাবেন। এরই মধ্যে অ্যাপটি ভক্তদের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

ক্রিকেট বিশ্বকাপ

আমরা করব জয়

বাংলাদেশ ক্রিকেট একটি আবেগের নাম। বাংলাদেশ দলের কোনো খেলা থাকলে দেশের মানুষ সব ভুলে যায়, মেতে উঠে ক্রিকেট উন্মাদনায়। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের একটি জয় সারাদেশের মানুষকে উদ্বেলিত করে। আনন্দে ভাসিয়ে দেয় পুরো দেশকে। দেশের প্রতিটি শিশু হতে চায় মাশরাফি, সাকিব, তামিম, মুশফিক—এই আবেগ, ভালোবাসা, ভালোলাগা শুধু ক্রিকেটকে ঘিরে। বাংলাদেশ ক্রিকেটের যাত্রা খুব বেশি দিন নয়, মাত্র ৩০ বছরের।

আমাদের স্বাধীনতার চেয়ে অনেক কম বয়েস আমাদের ক্রিকেটের। ১৯৮৬ সালের ৩১ মার্চ পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক একদিনের ক্রিকেটে প্রথম মাঠে নেমেছিল বাংলাদেশ। ২০০০ সালে অভিষেক হয় টেস্ট ক্রিকেটের। আর টি-টোয়েন্টি অভিষেক ২০০৬ সালের নভেম্বরে। এরপর আসতে থাকে আমাদের ক্রিকেটের দারুণ জয়গুলো। বিশ্বের প্রায় সব দলকে হারায় বাংলাদেশ। ২০১৫ সালে ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের সফলতা গর্ব করার মতো। বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা, ঘরের মাঠে পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ এবং ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে সিরিজ হারিয়ে চমক দেখিয়েছে টাইগাররা। ১৮টি ওয়ান ডে ম্যাচে জয় ১৩টি। পাকিস্তানকে পিছনে ফেলে ৭ নম্বর উঠে যায় ওয়ান ডে র‍্যাকিংয়ে। সর্বশেষ শ্রীলঙ্কার মাটিতে ১০০তম টেস্ট জয়। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে ড্র বাংলাদেশকে বিশ্ব ক্রিকেটে নতুনভাবে পরিচিত করে তুলেছে।

এবার আমাদের লক্ষ্য বিশ্বকাপ ক্রিকেট জয় করা। আর সেটির জন্য আমরা খুব দ্রুতই এগিয়ে যাচ্ছি—এমনটি বলেছেন শ্রীলঙ্কার সাবেক অধিনায়ক অর্জুনা রানাতুঙ্গা। তিনি বলেন, ২০২৩ সালে বিশ্বকাপ জয়ের দারুণ সম্ভাবনা বাংলাদেশের আছে। বাংলাদেশের ক্রিকেটের উন্নতিটা তাঁর চোখে খুব স্পষ্টই। যথেষ্ট প্রতিভাবান ক্রিকেটার আছে বাংলাদেশে। আমরা বিশ্বাস করি, ২০২৩ সালে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ জিততে পারে।

২০২৩ নয়, ২০১৯ সালেই বিশ্বকাপ জেতার সম্ভাবনা আছে—এমনটি বলেছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার তথা বিশ্বের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। তিনি অর্জুনা রানাতুঙ্গাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, আমার মনে হয় ২০১৯ সালেই ভালো সুযোগ আছে। আমরা উন্নতির মধ্যে আছি। আমরা যদি এটা ধরে রাখতে পারি, তাহলে আমাদের সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। গত ওয়ানডে বিশ্বকাপে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলেছি। ভারতের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে লড়াই করেছি। আমাদের উন্নতিটা উপরের দিকেই আছে। সাকিব আল হাসান আরো বলেন, আমাদের ভালো কিছু খেলোয়াড় আছে। ১৫০-এর বেশি ওয়ান ডে খেলা ক্রিকেটারদের সঙ্গে ১৫-১৬ ওয়ানডে খেলা ক্রিকেটারও রয়েছে। এই দুটির যোগসূত্রে আমরা ভালো দল হয়ে উঠছি। যারা তরুণ আছে, তারা সবাই অসাধারণ যোদ্ধা। এভাবে খেলতে থাকলে আগামী ২০১৯ সালের বিশ্বকাপ জয়ে আমাদের সম্ভাবনা থাকবে।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

বাল্যবিবাহকে 'না'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ইন্টারন্যাশনাল উইমেন অব কারেজ ২০১৭' পুরস্কার পাওয়া আমাদের ঝালকাঠির মেয়ে শারমিন তার পুরস্কারটি দেশের সব মেয়ে জন্য উৎসর্গ করেছে। সে আশা করেছে অন্য মেয়েরাও তার মতো বাল্যবিবাহের প্রতিবাদ করুক। নবারুণের বন্ধুরা, তোমরা তো এ খবরটি ইতোমধ্যেই সবাই

জেনে গেছো, তাই না? কিন্তু তোমরা এটা কি জানো শারমিনের এ চাওয়াটা দেশের আনাচেকানাচে বাস্তব রূপ পেতে শুরু করেছে? বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে রীতিমতো আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। নিজের বিয়ে নিজেই ঠেকাচ্ছে নয়ত অন্য কারো সাহায্য নিচ্ছে। অথবা স্বপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসছে কোনো সাহসী মেয়ে বা মেয়ের দল। তাদেরকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসছে প্রশাসন।

হ্যাঁ বন্ধুরা, আজ তোমাদের সেইসব গুটিকয়েক সাহসী মেয়ের কথা শোনাব যারা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ও উত্যক্ত করার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়েছে।

নিজের বাল্যবিয়ে ঠেকাল মাদ্রাসা ছাত্রী

ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার উজানপাড়া এতিমখানা আলিয়া মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী ১৩ বছর বয়সি সোনিয়া। ৭ এপ্রিল রাতে তার বিয়ে ঠিক হয়। কিন্তু যে সোনিয়া প্রতিদিন মাদ্রাসায় অ্যাসেম্বলিতে শিক্ষার্থীদের শপথ পাঠ করায়, বাল্যবিবাহকে 'না' বলা শেখায়, সে কীভাবে নিজের বাল্যবিয়ের বিষয়টি মেনে নেবে? সে প্রতিবাদী হয়ে উঠে।। কিন্তু পরিবারকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়। রাতেই সে মাদ্রাসা শিক্ষককে ঘটনাটি জানায়। সকালে শিক্ষক বাসায় এসে সোনিয়াকে মাদ্রাসায় নিয়ে যায় এবং মাদ্রাসা অধ্যক্ষের সহায়তায় ত্রিশাল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানানো হয়। ইউএনও মেয়ের বাবাকে ডেকে এনে বিয়ে ভেঙে দিতে বাধ্য করেন। অবশেষে সোনিয়া ক্লাসে ফিরে এবং বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পায়।

ঘাসফুল

ময়মনসিংহের নান্দাইল পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাত শিক্ষার্থী গড়ে তুলেছে একটি সামাজিক সংগঠন, নাম ঘাসফুল। তারা এলাকায় বাল্যবিবাহ ঠেকানো ছাড়াও যখনই রাস্তাঘাটে কোনো মেয়ে উত্ত্যক্তের শিকার হয়, তখনই রুখে দাঁড়ায় এই সাত সাহসী ছাত্রী।

১০ এপ্রিল তারা খবর পায় নান্দাইল পৌরসভার দশালিয়া মহল্লায় নবম শ্রেণির এক ছাত্রীর বিয়ের আয়োজন চলছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে অভিভাবকদের বোঝানোর চেষ্টা করে। ব্যর্থ হয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবরে আবেদন করে। এরপরই প্রশাসনের সহায়তায় তারা বাল্যবিয়েটি বন্ধ করতে পারে।

১৬ এপ্রিল আচারগাঁও ইউনিয়নের চানপুর গ্রামের সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীর বিয়ের প্রস্তুতি চলছিল। ঘাসফুল সেখানে হাজির হলে উলটো ধমক দিয়ে চলে যেতে বলা হয়। পরে প্রশাসনের সহযোগিতায় বাল্য-

বিবাহটি বন্ধ হয়। মেয়ের বাল্যবিবাহ দেবেন না বলে মুচলেখা দিয়ে বাবা ছাড়া পান।

উল্লেখ্য, বাল্যবিবাহ ঠেকানো সাহস দেখানোর জন্য এবং তাদেরকে আরো উৎসাহী করার জন্য তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। নান্দাইলের ইউএনও মো. হাফিজুর রহমান তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

কাজির দণ্ড

নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার কালেঙ্গা গ্রামের ১৭ বছর বয়েসি রিপন মিয়ার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছিল ১৫ বছর

বর-কনের বয়স যাচাই হবে মোবাইলে

বিয়ে নিবন্ধনের সময় বিয়ে নিবন্ধক আবশ্যিকভাবে তার মোবাইল ফোনের সাহায্যে কোড * ১৬১০০# ডায়াল করে বা ১৬১০০ নম্বরে এসএমএস পাঠিয়ে বর-কনের বয়স যাচাই করবেন।

বয়স নিশ্চিত হলে বিয়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করা হবে। নিবন্ধক নিবন্ধন শেষে সিস্টেম থেকে পাঠানো একটি ১২ ডিজিটের আইডি নম্বর পাবেন, যা সংশ্লিষ্ট বিয়ের নিবন্ধন নম্বর হিসেবে রেজিস্টারে সংরক্ষণ করবেন। এসএমএসের মাধ্যমে বিয়ে নিবন্ধন সম্পাদন সংক্রান্ত তথ্য বর-কনেকে পাঠানো হবে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের আওতায় প্রথম অবস্থায় কুড়িগ্রাম জেলায় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বয়স যাচাই ও বিবাহ নিবন্ধন বিষয়ক পাইলট প্রকল্পের এটি বাস্তবায়ন হবে। 'যদি মেয়ের বয়স ১৮ আর ছেলের বয়স ২১ আজ, যাচাই শেষে করুন বিয়ে নিবন্ধনের কাজ'—এই স্লোগানকে সামনে রেখে ১৯ এপ্রিল ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি।

বয়েসি এক মেয়ের। কেন্দুয়ার ইউএনও ঘটনাস্থলে হাজির হলে ভ্রাম্যমান আদালত কাজি আবদুল্লাহ আল মামুনকে দুই মাসের কারাদন্ড দেন। কিশোর-কিশোরী মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পায়।

এছাড়া বগুড়ার আদমদিঘি এবং সিরাজগঞ্জ সদরে প্রশাসনের উপস্থিতি টের পেয়ে বিয়ের আসর থেকে বর পালিয়ে গেছে।

সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে দেশ।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

অতুলন বাংলার শিশুমেলা

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা কি কখনো সাপের খেলা,বানরের খেলা দেখেছ? আবার কুমার কীভাবে মাটির পাত্র তৈরি করে এগুলো দেখেছ? সাধারণত এগুলো শহর থেকে দূরে গ্রামে দেখা যায়। আর তাই শহুরে শিশুদের মাঝে গ্রাম- বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরার উদ্দেশ্যে আয়োজিত হয়ে গেল 'অতুলন বাংলার শিশুমেলা'। গত ৭ এপ্রিল রাজধানীর মোহাম্মদপুর ইকবাল রোড ক্লাব মাঠে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অতুলন বাংলার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মাদ এহসানুল হক বলেন,শিশুদের স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবন গড়ে তোলার জন্য অতুলন বাংলা বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসহ অবিভাবকদের সাথে কাজ করবে।

সারাদিনের এ মেলা শিশু-কিশোর ও অবিভাবকদের এক মিলন মেলায় পরিণত হয়। মেলায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৫ থেকে ১২ বছর বয়েসি ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছিল। বেশকিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্টলে তাদের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ, ছবি আঁকা প্রদর্শন করা হয়। অন্যদিকে শিশুদের আনন্দের জন্য সাপের খেলা,বানড়ের খেলা, কুমার কীভাবে মাটির পাত্র তৈরি করে এগুলো দেখানো হয়। মেলায় উপস্থিত শিশুদের মাঝে হাতের কাজ, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগিতা ছিল এ মেলাতে। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী শিশুদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এ মেলায় সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শিশুরা অনেক আনন্দ-মজা করে বাড়ি ফিরে।

সায়মা ওয়াজেদ

ডব্লিউএইচও'র অটিজম বিষয়ক আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন

অটিজম শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সুযোগ্য কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন। অটিজম বিষয়ক বাংলাদেশের জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি সায়মা ওয়াজেদ। তাঁকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের 'অটিজম বিষয়ক চ্যাম্পিয়ন' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসের ঠিক আগের দিন অর্থাৎ ১ এপ্রিল জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সংস্থা তাঁকে এই অভিধা দেয়। এই উপাধির ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১১টি দেশে অটিজম বিষয়ক জাতীয় নীতি ও কৌশল প্রণয়নে পরামর্শ সহায়তা দেবেন সায়মা ওয়াজেদ। তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশের প্রচারণার পাশাপাশি এ রোগে আক্রান্ত শিশু, তাদের বাবা-মা ও পরিচর্যাকারীদেরকে বিভিন্ন সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য কাজ করবেন।

সায়মা ওয়াজেদকে এ দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়ে ডব্লিউএইচও'র আঞ্চলিক পরিচালক পুনম ক্ষেত্রাল সিং বলেন, 'সায়মা ওয়াজেদের আত্মনিয়োগ ও অভূতপূর্ব প্রচেষ্টায় তাঁর দেশ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অটিজম ব্যাপক মাত্রায় গুরুত্ব পেয়েছে। একই সাথে তিনি অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার (এএসডি) ও অন্যান্য মানসিক ব্যাধির বিষয়ে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ সহায়তা ও বৈশ্বিক মনোযোগ কাড়তে সক্ষম হয়েছেন'।

প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের আঁকা ছবি নিয়ে বই

শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের আঁকা ছবি নিয়ে অটিজম বিশেষজ্ঞ সায়মা ওয়াজেদ পুতুল একটি বই প্রকাশ করেছেন। ৪ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের উইঙি হলে ১৩৬ তম আইপিইউ সম্মেলনে 'অনন্য ছবি' বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়। বইটি সম্পর্কে সায়মা ওয়াজেদ বলেন, 'অটিজম আক্রান্ত শিশু-কিশোর ও তরুণদের ২৬০টি চিত্রকর্ম রয়েছে এই বইটিতে। তাই বইটি এসব শিল্পীর স্বপ্ন। এই বইয়ের মাধ্যমে তারা পুরো বিশ্বকে দেখছে। বই বিক্রির টাকা সূচনা ফাউন্ডেশনকে দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা যেন অটিজমদের অসাধারণ এসব দিক দিয়েই তাদের দেখি। তারা অটিস্টিক। এই অসুস্থতা দিয়ে যাতে তাদের বন্দি না করি। একটু সুযোগ পেলেই অটিস্টিকরা তাদের মেধার বিকাশ ঘটিয়ে এগিয়ে যাবে।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

মধুমাসের মধু ফল

ফুল ও ফলের মাস গ্রীষ্মকাল। এই ঋতুতে গাছে গাছে যেমন নানা রঙের ফুলের সমারোহ তেমনি ফলের ভারে নুইয়ে থাকে বৃক্ষরাজি। তাই তো গ্রীষ্মকে বলা হয় মৌসুমী ফলের ঋতু। মধুর রসে সুমিষ্ট ফলের জন্য জ্যৈষ্ঠ মাসকে মধুমাস বলে ডাকা হয়। তাই তো ছড়াকার তার ছড়ায় মধুমাসের ফলের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

জাম জামরুল কদবেল
আতা কাঁঠাল নারকেল
তাল তরমুজ আমড়া
কামরাঙা বেল পেয়ারা
পেঁপে ডালিম জলপাই
বরই দিলাম আর কী চাই?
হ্যাঁ আরো আছে আম আর লিচু?

ছড়াকার সম্ভবত ঠিক মেলাতে পারেননি বলে মৌসুমী ফলের এই মজার ছড়াটিতে গ্রীষ্মের সবচেয়ে সুস্বাদু আর রসালো ফল আম আর লিচুর নাম বাদ পড়ে গেছে।

এখন চলছে মধুমাস, রসালো ফলের মাস। গাছে গাছে ঝুলছে আম, বেল, পেয়ারা, মন ভোলানো লাল লিচু, জাম, কচি তাল শাঁস, জামরুল, পানিফল, আতা আর আমাদের জাতীয় ফল কাঁঠাল।

আমাদের দেশি ফলগুলো যেমন সুস্বাদু তেমনি স্বাস্থ্য রক্ষায় এর কোনো বিকল্প নেই। সুস্বাস্থ্যের জন্য ফল খাওয়া খুব জরুরি। শরীরের ভিটামিনের প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে ফল। সবার বেশি করে মৌসুমী ফল খাওয়া উচিত। কারণ এসব ফলে রয়েছে ফাইবার যা খাবার হজমে সাহায্য করে। এছাড়া প্রচুর পানিও রয়েছে। ফল অ্যান্টি অ্যাসিডিক।

ফলের উপস্থিত অর্গানিক অ্যাসিড ও ন্যাচারাল হাই সুগার শরীর সুস্থ ও তাজা রাখে, সঙ্গে শক্তি দেয়। ফলে প্রোটিন ও ফ্যাটের পরিমাণ কম থাকে। ভিটামিন মিনারেল ও এনজাইমসমৃদ্ধ ফল আমাদের রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

ফল হাই ব্লাড প্রেসার ও কোলেস্টোরেল নিয়ন্ত্রণ করে, হার্টের সমস্যা প্রতিরোধ করে। স্থূলতা ঠেকাতে টক জাতীয় ফল অর্থাৎ ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল খেলে উপকার পাওয়া যায়। এজন্য নিয়মিত ফল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। শিশু বিশেষজ্ঞরা বলেন,

শিশুদের জন্য প্রতিদিন অন্তত একটি ফল খাওয়া অপরিহার্য।

মধুমাসে ফুলে ফুলে মৌ মৌ
পাখি তোলে সুর
গাছে গাছে আম জাম
ফলে ভরপুর।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

অয়ালিদ হাসান, নবম শ্রেণি, কুষ্টিয়া জেলা স্কুল, কুস্টিয়া

মাকনুন মুরছাহা, এসটিডি ৩, রামু ক্যান্টমেন্ট ইংলিশ স্কুল, কক্সবাজার

মিথিলা মাহবুব, অষ্টম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, (ধানমন্ডি শাখা)

লিলি বিশ্বাস, দশম শ্রেণি, খিলবাড়িরটেক ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

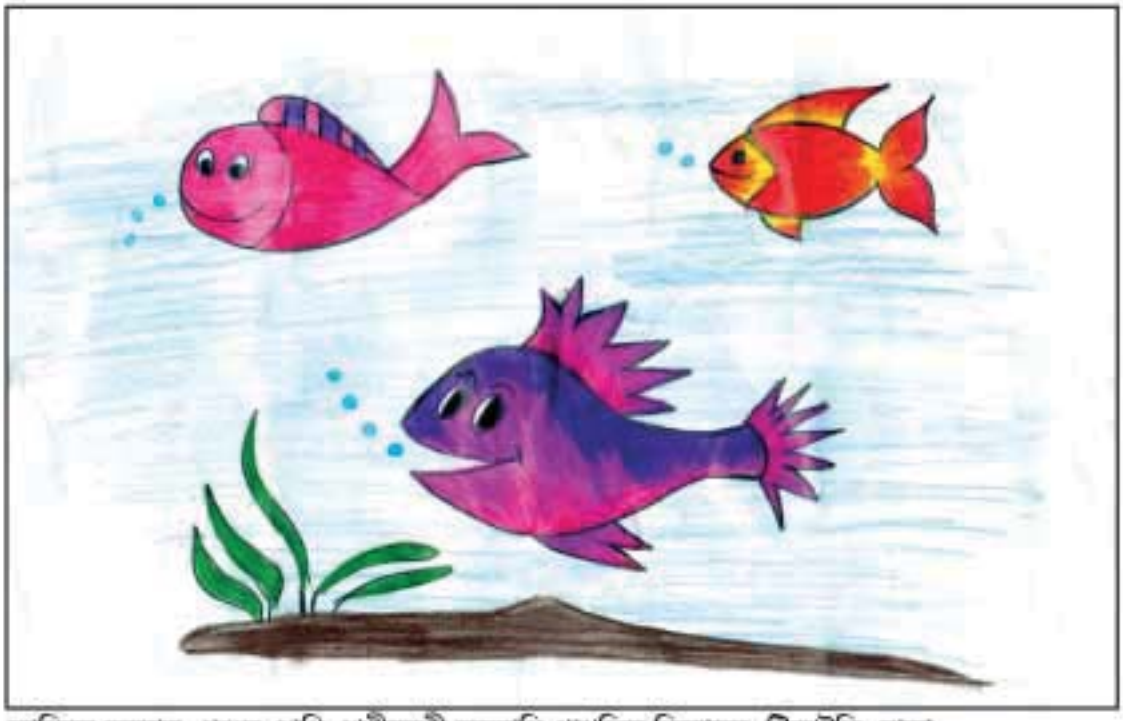

আবিদুর রহমান, পঞ্চম শ্রেণি, শহীদনবী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, টিকাটুলি, ঢাকা

মোবারক হোসেন, অষ্টম শ্রেণি, ভাওয়াল মির্জাপুর স্কুল, গাজীপুর

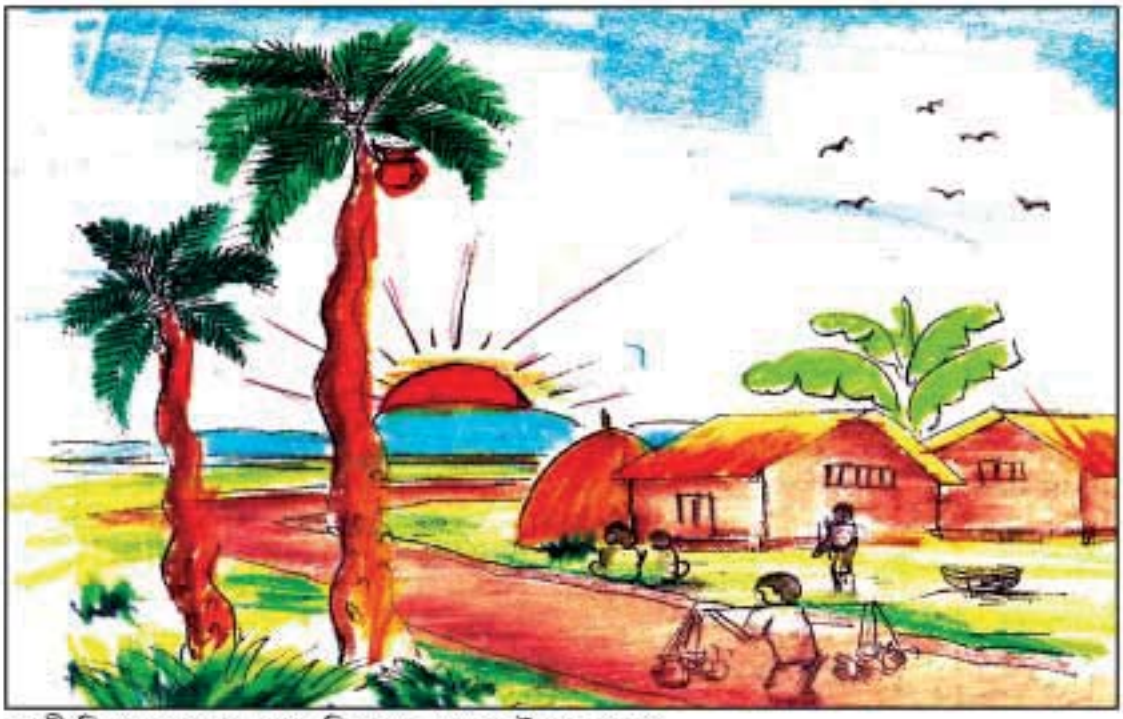

কাজী সিফাত রায়হান, ধানমন্ডি গভ. বয়েজ হাই স্কুল, ঢাকা

মো. ওয়াজেদ হোসেন পরশ, নার্সারি শ্রেণি, ক্যালিক্স স্কুল, গ্রীনরোড, ঢাকা

তোমাকে অভিবাদন বাংলাদেশ

বাংলা সনের দ্বিতীয় মাস জ্যৈষ্ঠ। এর আরো একটি সুন্দর নাম আছে। তা হলো মধুমাস। এ সময় নানা রকম মিষ্টি মধুর রসালো স্বাদের ফল পাওয়া যায়।

তোমাদেরকে জানাই মধুমাসের অনেক শুভেচ্ছা।

বন্ধুরা, এবার তোমাদের জানাব বিশ্বে বাংলাদেশ-এর আরেকটি গৌরবের কথা। পোশাক তৈরি ও রপ্তানিতে বিশ্বের বুকে দ্বিতীয় শীর্ষস্থান অধিকার করেছে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। চীনের পরেই আমাদের অবস্থান। তোমরা তো জানো, পোশাকখাত আমাদের অর্থনীতিতে রাখছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এর মাধ্যমে আমাদের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বেড়েছে কর্মসংস্থান। কমেছে দরিদ্রতা। এ পোশাক শিল্প এখন পরিণত হয়েছে অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তিতে। তোমরা আরো জেনে খুশী হবে, আমাদের দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮১ শতাংশই আসে তৈরি পোশাক শিল্প থেকে। এ শিল্পে কাজ করছে ৪০ লাখ মানুষ। যার ৯৩ শতাংশই নারী। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দরিদ্রতা দূর করার পাশাপাশি এ শিল্প আড়াই থেকে তিন কোটি মানুষের জীবন জীবিকায় রাখছে বিস্ময়কর অবদান। সবার প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাচ্ছে এ শিল্প, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

সাদিয়া ইফফাত আঁখি